প্রথম বর্ষ চতুর্থ-পঞ্চম বিশেষ সংখ্যা। জুলাই-অক্টোবর ২০১৯। ৪০ টাকা

ভয়েস মার্ক

আর্থিক সঙ্কট ▸▸এনআরসি ▸▸ ট্রিপল তালাক আইন ▸▸ শিশুর পুষ্টি ▸▸ গ্রেটা থুনবার্গ ▸▸ বাঙালি চেতনা ▸▸ মৌচাক প্রযৌক্তিক আর্থসমাজ ▸▸ ব্যক্তি ও আর্থসমাজ ▸▸ ছেলে মানুষ করা ▸▸ ধর্ম-রাজনীতি ▸▸ অধিকার প্রতিষ্ঠা ▸▸ উন্নয়ন ▸▸ হিন্দুমুসলমান ▸▸ নাটিকা ▸▸ গল্প ▸▸ স্যাটায়ার ▸▸ কবিতা

ভয়েস মার্ক

দ্বি-মাসিক পত্রিকা

সম্পাদক
মো. ফিরোজ হোসেন

প্রতি সংখ্যার মূল্য ২০ টাকা
গ্রাহক চাঁদা সডাক ১০০ টাকা। যে কোনো সংখ্যা থেকে গ্রাহক হওয়া যায়।
গ্রাহক পরিষেবায় যোগাযোগ : রনিক পারভেজ, ৯৩৭৮৪৮০১৯২

পত্রিকার যোগাযোগ স্থান
বহরমপুর : ৯৯৩২৮৩৭১৮৫
বর্ধমান : ৮১১৬২৭৯১৫২
বাঁকুড়া : ৯৩৭৮৪৮০১৯২
দ: ২৪ পরগণা : ৮৯২৬৭৪৪১৪০
উত্তরবঙ্গ : ৯৪৩৪৬৫৫৬১০

যোগাযোগ
পিরতলা, উপর ফতেপুর,
লালগোলা, মুর্শিদাবাদ, পিন ৭৪২১৪৮.
E-mail: voicemark19@gmail.com
Mob: 9434655610

ভয়েস মার্ক

প্রথম বর্ষ চতুর্থ-পঞ্চম যুগ্ম সংখ্যা। জুলাই-অক্টোবর ২০১৯।

সম্পাদক
মো. ফিরোজ হোসেন
voicemark19@gmail.com
WhatsApp : 9434655610

গ্রাহক পরিষেবা: রনিক পারভেজ, ৯৩৭৮৪৮০১৯২

নামলিপি ও প্রচ্ছদ চিত্র : হিমাদ্রী শেখর মজুমদার

মূল্য : চল্লিশ টাকা

মো. ফিরোজ হোসেন কর্তৃক পিরতলা, উপর ফতেপুর, লালগোলা, মুর্শিদাবাদ, পিন ৭৪২১৪৮ থেকে প্রকাশিত এবং তৎকর্তৃক কিস অফসেট প্রেস, বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ ৭৪২১০১ থেকে মুদ্রিত।

সম্পাদকীয়

আর্থিক সংকট, জনজীবন ও রাজনৈতিক চেতনা ৩

সাম্প্রতিক প্রসঙ্গ

জাতীয় নাগরিক পঞ্জি— আতঙ্ক কেন? ৫
শিশুর পুষ্টি ও বৃদ্ধিতে রক্ষণকামিতার কালো হাত ১০
তাৎক্ষণিক ট্রিপল তালাক বিরোধী আইন ১২
রাষ্ট্রপুঞ্জের পরিবেশ সম্মেলনে গ্রেটা থুনবার্গ ১৬
'গো-হারা' ১৮
নাগরিক পঞ্জির সত্যি কি কোনো প্রয়োজন আছে? ১৯

প্রবন্ধ

বাঙালি চেতনা ও নাগরিক পঞ্জির হুমকি ২২
শ্রীচেতনিক
মৌচাক প্রযৌক্তিক আর্থসমাজ ২৫
'অস্তিত্ব': বিশ্লেষণ ও সম্পাদনা - ইমদাদুল হক
গণতন্ত্রের সংকট ২৭
আযাদ রহমান
ব্যক্তি ও আর্থসমাজের আন্তঃসম্পর্ক ৩০
কিংশুক সন্ন্যাসী
ছেলে মানুষ করা ৩৪
সঞ্জীবন
ধর্ম-রাজনীতি ও ধর্মনিরপেক্ষতা ৩৬
উজান
অধিকার প্রতিষ্ঠা ৩৮
প্রভাস গোস্বামী
রক্ষণকামিতার হরেক বোল ৩৯
মিনারুল হক
উন্নয়ন পরিকল্পনা শ্যামল কান্তি পাড়ুই ৪৩

নাটিকা

প্যারাডাইস সুকৃতি ৪৬

গল্প

অপেক্ষা তানিয়া খাতুন ৫৪
কনে দেখা বরুণ শ্যেন ৫৮
উত্তরণ আল আমিন ৬০

স্যাটায়ার

ঝোলাগুড় ও কানামাছি অনীক ৬৪

কবিতা

পরশ মিনারুল হক ৬৭
মাছরাঙা দিন তুষার ভট্টাচার্য ৬৮
একা তমাল মুখোপাধ্যায় ৬৯
রথের রশি ফিরোজ ৭০

পুনঃস্মরণিকা

হিন্দুমুসলমান রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ৭১

'অস্তিত্ব' প্রকাশিত গ্রন্থাবলি

১। অস্তিত্বঃ প্রবেশিকা (২১টি প্রবন্ধ)	১৫০.০০
২। অস্তিত্ব △ মানুষঃ দেহপূর্ব, দেহান্তপূর্ব এবং ... বর্তন ক্রমঃ এক	২০০.০০
৩। অস্তিত্ব △ মানুষঃ দেহপূর্ব, দেহান্তপূর্ব এবং ... বর্তন ক্রমঃ দুই	২০০.০০
৪। দেহমনের নিয়ন্ত্রণ এবং ...	১৩০.০০
৫। জীবন দিশারী 'অস্তিত্ব'	৩০.০০
৬। মেধা প্রতিভা কি ভাগ্য (!) বাচক? কী তার লভ্য প্রযুক্তি?	১৫০.০০
৭। দাম্পত্য প্রযৌক্তিক পরিবার সমিতি	৩০.০০
৮। বস্তু প্রযুক্তি নির্মাণী 'অস্তিত্ব'	২৫.০০
৯। সত্তার অর্গল ভাঙাটাই মনের দরজা খোলার রহস্য	৪০.০০
১০। শ্রমমূল্যের শান্তি রথ	১০০.০০

'অস্তিত্ব' প্রকাশেয় গ্রন্থাবলি

১। পূর্বপ্রসঙ্গ	১৬টি কলম
২। সৃষ্টিতত্ত্ব	২২টি কলম
৩। জীবনতত্ত্ব	৪৮টি কলম
৪। দেহতত্ত্ব	৮টি কলম
৫। জীবতত্ত্ব	১টি কলম
৬। ঋজুতত্ত্ব	৭৪০টি কলম
৭। সরেজমিন বা স্পটলাইট	একটি সিরিজ
৮। একসোডাস কল্লোল (কবিতা)	একটি সিরিজ
৯। অস্তিত্ব △ মানুষঃ দেহপূর্ব, দেহান্ত পূর্ব এবং ...	একটি সিরিজ

প্রকাশক: গাইডেন্স ফাউন্ডেশন
ফোন: ০৩৩-২২৮০-৬৭০৯/৫৫০৫
১৯৭ পার্কস্ট্রিট, কলকাতা-১৭, (পার্ক সার্কাস ময়দানের পাশে)
যোগাযোগ: ৯৮৩০০৬৯৫২৫
E-mail: emdadul197@gmail.com

সম্পাদকীয়

আর্থিক সংকট, জনজীবন ও রাজনৈতিক চেতনা

দ্বিতীয় টার্মে ক্ষমতায় এসেই ভারতীয় জনতা পার্টির সরকার ঘোষণা করল– দেশের অর্থনীতির আগামী পাঁচ বছরে লক্ষমাত্রা ৫ ট্রিলিয়ন ডলার। প্রথম টার্মেও এমনতর অনেক চমক ছিল, যেমন নোট বাতিল। যাতে স্বাধীনতার পর থেকে বিদেশের মাটিতে জমা হওয়া কালো টাকা উদ্ধার করব। কিন্তু তার পর কী হয়েছে, তা সবাই জানে। কৃষি-শিল্প-পরিষেবা কর্মসংস্থান ভয়ানক বেহালে পড়ে গেলেও তারা আবার ক্ষমতার তখত্ এ।

কিন্তু বিরাট সংখ্যাগরিষ্ঠতায় তখত্ সুরক্ষিত থাকলেও দেশের অর্থনীতির হাঁড়ির হাল ফেটে বেরোচ্ছে। ২০১৯ -২০ আর্থিক বছরের প্রথম ত্রৈমাসিকে আর্থিক বৃদ্ধি কমে ৫ শতাংশ। প্রধানমন্ত্রীর প্রাক্তন আর্থিক উপদেষ্টা অরবিন্দ সুব্রহ্মনিয়াম আর্থিক বৃদ্ধির তথ্যের ম্যানিপুলেশন এর অভিযোগ করেছেন। আইএমএফ, বিশ্ব ব্যাঙ্কও এ ব্যাপারে কড়া মন্তব্য করেছে। কৃষি, ম্যানুফ্যাকচারিং শিল্প, বস্ত্র, অটোমোবাইল সবেতেই ধ্বস নেমেছে। কেবলমাত্র অটোমোবাইল ক্ষেত্রে ৩.৫ লক্ষেরও বেশি মানুষের কর্মহানি ঘটেছে। বস্ত্র শিল্পেরও ভয়ানক অবস্থা। ইতিমধ্যে পূর্বেকার নোট বাতিলের ও গুডস এণ্ড সারভিস ট্যাক্সের ধাক্কায় ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প ক্ষেত্রেও অবস্থা খুব খারাপ। ৪৫ বছরের মধ্যে সবচেয়ে বেশি বেকারত্বের হার। গ্রামীণ মজুরি বৃদ্ধির হার অত্যন্ত কমে এসেছে। যা ২০১৪ সালে ছিল ১৪.৬ শতাংশ, ২০১৯ সালে তা ১.১ শতাংশ। চাহিদাহীনতায় কর্পোরেট পুঁজির বৃহৎ শিল্প চরম মন্দায়। গাড়ি থেকে বিস্কুট সর্বক্ষেত্রেই এই নিম্নচাহিদা অর্থনীতিতে মন্দা ডেকে এনেছে। শাসকের ভাড়াখাটা প্রবক্তারা যতই আন্তর্জাতিক ফ্যাক্টরকে দায়ী করুক, সারা পৃথিবীর অর্থনীতি আপাত স্থিতিশীল। ভারতের যে মন্দা পরিস্থিতি তা তার অভ্যন্তরীণ কারণেই। মুক্তবাজার অর্থনীতির প্রবক্তারা এখনও পর্যন্ত কেউই গ্লোবাল ফ্যাক্টরকে দায়ী করেননি। যাইহোক বাজার চাঙ্গা করার জন্য এই পরিস্থিতি সামাল দিতে শাসক ১.৪৫ লক্ষ কোটির বিশাল অঙ্কের ট্যাক্স কর্পোরেট পুঁজিকে ছাড়ের ঘোষণা করেছে। ব্যাঙ্ক মার্জারের ঘোষণা করেছে। যেন ব্যাঙ্ক মার্জারে লোকসানে চলা ব্যাঙ্ক লাভ করতে শুরু করবে। অনেকেই অভিযোগ তুলেছেন ব্যাঙ্ক মার্জার আসলে কর্পোরেটের ঋণ বিলোপের নতুন কৌশল। এসবে কি আদৌ তার সংকট ঘুচবে? বিশ্বায়িত কর্পোরেট পুঁজি মুনাফার সম্ভাবনাহীন দেশে কি বিনিয়োগ করবে?

এই পরিস্থিতি তৈরি হল কী করে? এক নজরে মোটা দাগের কয়েকটি কারণের কথা বলছেন সেই মুক্তবাজারেরই প্রবক্তারা–

১। ডিমানিটাইজেশন– যার অব্যবহিত পরেই কর্পোরেট বিনিয়োগ ৬০ শতাংশ কমেছে। ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প ও ব্যবসা লাটে উঠেছে।

২) গুডস এণ্ড সারভিস ট্যাক্সের অপরিণামদর্শী প্রয়োগ। যাতে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই ছোট, মাঝারি ব্যবসায়ী মার খেয়েছে।

৩) ২০১৯ এর কেন্দ্রীয় বাজেট স্টক মার্কেট ও বিনিয়োগকারীদের অখুশি করেছে। কারণ বাজেট অস্বচ্ছ ও অসম্পূর্ণ।

৪) ব্যাপক বেকারত্ব– হোম মার্কেটের সবচেয়ে করুণ দশা।

৫) পাবলিক সেক্টরের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে যোগ্যতম লোকেদের সরিয়ে অযোগ্য লোকেদের বসানো। যাতে প্রতিষ্ঠানগুলির স্বাধীনভাবে কাজ করার ক্ষমতা সংকুচিত হয়। এমনি করেই ONGC এর মত বহু সরকারি প্রতিষ্ঠান দীর্ঘদিন ধরে লাভজনক ভাবে ব্যাবসা করলেও ক্ষতির মুখে পড়েছে।

এইগুলিই কি কারণ? হ্যাঁ, রক্ষণকামী মুক্তবাজার অর্থনীতির আপাত সুস্থিরতার বিপক্ষে কর্পোরেট পুঁজির সংকটের এইগুলি কারণ হতে পারে। কিন্তু মূল কারণ এগুলি নয়। মূল কারণ নিহিত আছে পুঁজির কেন্দ্রীকরণ প্রবণতার মধ্যে। সেই জন্যই তাকে সংকটে পড়তে হয়। ব্যাপক জনতার শ্রম শোষণের মুনাফাভিত্তিক অর্থনীতির পরিণামে চাহিদা সংকট দেখা দেয়। তার থেকে বেরনোর জন্য আপাত কিছু পলিসিও তারা সরকারকে নেওয়ায়। কিন্তু তা কতদিন? ব্যাপক জনতার রায়-এ নির্বাচিত সরকার যখন কর্পোরেটের হাতের পুতুল হয়ে তার সমস্ত পলিসিকে তাদের মুনাফার উপযোগী করতে শুরু করবে তখন সেই মুনাফার কেন্দ্রীকরণের অনিয়মটিতেই দারিদ্র ও বেকারত্ব আর্থসমাজে সংক্রামিত হয়। লোকের কাছে টাকা থাকে না অর্থাৎ ক্রয়ক্ষমতা থাকে না। মানেই চাহিদা সংকট অর্থাৎ আর্থিক বৃদ্ধির ফানুস তখনই ফাটে।

অতঃপর!

আর্থিক সংকট মানে কর্পোরেট পুঁজিরই অস্তিত্ব সংকট। তাতে ব্যাপক জনতা কীভাবে জড়িত? উৎপাদক হিসেবে। অংশীদার হিসেবে নয়। তার কাছে ভাড়া খাটা দাস শ্রমিক হিসেবে। এই যে দাস-মালিকি শ্রম সম্পর্ক তার উৎখাত না করলে পুঁজির সংক্রামিত পুঁজিরই সংকটে গোটা আর্থসমাজকে ভুগতে হবেই।

তাই লাগামহীন মুনাফার এই অনিয়ন্ত্রিত মুক্তবাজার অর্থনীতিকে লাগাম পরিয়ে নিয়ন্ত্রিত অর্থনীতির প্রণয়নের আর্থসমাজ-সাংস্কৃতিক রাজনীতির বাস্তবতা নির্মাণের কোনো বিকল্প নেই। আমরা সাংস্কৃতিক প্রশ্নে অর্থনীতির এই রাজনীতিটি ধরতে পারছি, ধরতে চাইছি? যদি ধরতে পারি, ধরতে চাই তাহলে এই কর্পোরেট পুঁজির বিরুদ্ধে আর তার দোসরদের বিরুদ্ধে আর্থসমাজকে সাংস্কৃতিক চেতনায় উদ্দীপ্ত করার কাজ এখনই শুরু করতে হবে। যে উদ্দীপনাতে নির্মিত রাজনীতিক চেতনাই পারে অর্থনীতিকে নিয়ন্ত্রণ করে আর্থসমাজের কল্যাণ ঘটাতে।

আশু পদক্ষেপ, অস্তিত্ব দর্শন ব্যাখ্যাত অর্থনীতির বিবিধ নীতিমালার পাঠ। জীবন সমস্যার প্রতিকারে অধ্যয়ন ও অনুধাবন, অনুধাবন অধ্যয়নের কোনো বিকল্প আছে কি? আর তার পরেই অধ্যায়, সেই মহান দার্শনিকের কথা— দার্শনিকরা এতদিন ধরে পৃথিবীকে কেবল ব্যাখ্যাই করে গেলেন, আসল কাজ হল তাকে পাল্টে দেওয়া।

সাম্প্রতিক প্রসঙ্গ

জাতীয় নাগরিক পঞ্জি – আতঙ্ক কেন?

রক্ষণকামী ক্ষমতাতন্ত্র সব যুগেই ডিভাইড এণ্ড রুল পলিসির আশ্রয় নেয়। মানুষের অধিকার আন্দোলন থেকে বাঁচার এটিই তার জিয়ন কাঠি। অতীতের ক্ষমতাতন্ত্র এভাবেই দেশের অভ্যন্তরে কোথাও প্রাদেশিক সেন্টিমেন্ট, কোথাও ভাষা সেন্টিমেন্ট, কোথাও জাত-পাতের সেন্টিমেন্ট, কোথাও ধর্ম সেন্টিমেন্ট উসকে নিপীড়িত মানুষের ঐক্য বিনষ্ট করে তাদের শাসন শোষণের চাকা চালু রেখেছিল। বর্তমান ক্ষমতাতন্ত্র সেই কাণ্ডেরই অনুবৃত্তি করছে। যেমন আসাম।

আসাম রাজ্যের ভৌগোলিক, ভাষাগত, সংস্কৃতি ও কৃষ্টিগত স্বাতন্ত্র্য ভারতের অন্যান্য রাজ্যের মতই। কিন্তু স্বাধীনতার সময় থেকেই সেখানে বাঙালি ও অসমিয়াদের মধ্যে বিরোধ উসকানো হয়েছে। যার পরিণামে আসামের প্রাদেশিক ও ভাষাগত সেন্টিমেন্ট বিচ্ছিন্নতাবাদী মানসিকতা সংক্রমণ করে। গত শতকের ৭০-৮০ এর দশকে তার রক্তক্ষয়ী ভয়াবহতাও লক্ষ্য করা যায়। যারই এক পর্যায়ে কেন্দ্রে ক্ষমতাসীন তৎকালীন রাজীব গান্ধির কংগ্রেস সরকার, আসাম রাজ্যের কংগ্রেস সরকার ও বাঙালি অনুপ্রবেশকারী বিরোধী গোষ্ঠীর ত্রিপাক্ষিক চুক্তি হয় ১৯৮৫ সালে। যা Assam Accord 1985 নামে পরিচিত।

পরবর্তীতে ২০০৯ সালে আন্দোলনকারী গোষ্ঠীর তরফে সুপ্রিম কোর্টে আসাম Accord বাস্তবায়নের দাবী উঠে। যাতে সুপ্রিম কোর্টে র্নিদেশে দেয় সেখানে NRC– National Registrar of Citizen বাস্তবায়ন করতে। ২০১৬ সাল থেকে এই প্রক্রিয়া শুরু হয়। বিক্ষুব্ধ গোষ্ঠীর দাবী ছিল ৩১ লক্ষেরও বেশি বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারী আসামে প্রবেশ করেছে। ২০১৮ সালে জুলাইয়ে NRC-র খসড়া তালিকা প্রকাশ করা হয়। তাতে দেখা যায় ৪০ লক্ষ মানুষ সেই তালিকা থেকে বাদ পড়েছে। ৩১ আগষ্ট ২০১৯ চূড়ান্ত তালিকা বেরলে দেখা যায় সেখানে ১৯ লক্ষের কিছু বেশি মানুষ সেই তালিকায় স্থান পাননি। তাদের জন্য প্রথমে ফরেনার ট্রাইবুনালে ও পরবর্তীতে সুপ্রিমকোর্টে আবেদনের সুযোগ থাকছে। সরকারি হিসেবে ওই প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে ১২৫০ কোটি টাকা খরচ হয়েছে। রাজ্যের পঞ্চাশ হাজার কর্মচারিকে কাজে লাগানো হয়েছিল।

বিভিন্ন বেসরকারি ও স্বেচ্ছাসেবি সংস্থার হিসেবে সেখানের প্রতি নাগরিকের এই প্রক্রিয়ার ন্যূনতম ২০ হাজার টাকা খরচ হয়েছে। সেই হিসেবে সরকারি খরচ বাদেও ৭৬ হাজার কোটি টাকা খরচ হয়েছে। যাতে আসাম রাজ্যের অর্থনীতি একেবারে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে। সব ক্ষেত্রের মতই এখানেও প্রান্তিক মানুষরাই আক্রান্ত হয়েছেন বেশি।

২০১৬ থেকে খসড়া তালিকা প্রকাশ অর্থাৎ জুলাই ২০১৮ পর্যন্ত সময়ে হয়রানি, যাতনা, আশঙ্কা, ডিটেনশন ক্যাম্পের ভয়াবহতা সবকিছু মিলিয়ে ৫৪ জন মানুষ মারা যান। চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশিত হবার পর সে সংখ্যা ৭০ পার হয়ে গেছে।

তালিকার কার্যকারিতা কী হবে, যারা অ্যাপিল গুলিতেও নিজেদের নাগরিক প্রমাণ করতে পারবেন না তাদের নিয়ে কী করা হবে এখনও পর্যন্ত ভারত সরকার তা নিয়ে কোনো সুস্পষ্ট ঘোষণা করেন নি। তবে ৬ টি ডিটেনশন ক্যাম্প বাদেও বিভিন্ন জেলায় বহু ডিটেনশন ক্যাম্প তৈরি হচ্ছে সে খবর সংবাদ মাধ্যমগুলির সূত্রে পাওয়া যাচ্ছে।

তালিকা প্রকাশের পর দেখা যাচ্ছে বৈধ কাগজপত্র থাকা ব্যক্তিদের অনেকের নাম ওঠেনি। একই পরিবারের স্বামী-পুত্র-কন্যার নাম আছে তো স্ত্রীর নেই। মা-র আছে তো বাবার নেই। মা-বাবার থাকলে ছেলের নেই এমন এক নারকীয় যন্ত্রণার মধ্যে যারা NRC,

NRC করে লাফাচ্ছিল তারা পর্যন্ত শাসকদলের বিরুদ্ধে মুর্দাবাদ শ্লোগান তুলছে। অসমিয়া সেন্টিমেন্টও সন্তুষ্ট নয়, কংগ্রেস সন্তুষ্ট নয়।

এনআরসির দাবীদাররা সন্তুষ্ট নয় কেন তা অনুধাবন করা যাচ্ছে। তাদের দাবী মত অনুপ্রবেশের তত্ত্বটি নস্যাৎ হয়ে গেছে। ভারতীয় জনতা পার্টির অসন্তোষের কারণ দুটি। তাদেরও অনুরূপ অনুপ্রবেশ তত্ত্ব ছিল। তার ফানুস ফেটে গেছে। আর সবচেয়ে বড় যে কারণে তাদের ঐ অসন্তোষ তা হল তালিকা ছুট লোকেদের মধ্যে হিন্দুদের সংখ্যা। তাদের সংখ্যায় সিংহভাগ। ১৭ লক্ষ বাঙালির মধ্যে ১১-১২ লক্ষ হিন্দু। বাকী ৫-৬ লক্ষ মুসলিম। কিন্তু তাদের বরাবরের দাবী ছিল মুসলিম অনুপ্রবেশকারীর সংখ্যা অনেক বেশি।

অনুপ্রবেশ তত্ত্ব

এটি অতিজাতীয়তাবাদী ঝোঁক সংক্রমণের খুব সহজ উপায়। যেভাবে কর্পোরেট পুঁজি পৃথিবীর সর্বত্র এই অতিজাতীয়তাবাদকে আজ মাথায় তুলছে। সে ডোনাল্ড ট্রাম্প হোক, কি বরিস জনসন হোক কি আমাদের দেশে ভারতীয় জনতা পার্টি হোক। এর মোদ্দা কথা হল দেশের যাবতীয় সমস্যার মূলে এই অনুপ্রবেশকারীরা। দেশের ব্যাপক মানুষের জীবনের মৌলিক সমস্যা, কর্মসংস্থান, স্বাস্থ্য, পরিবহন, ব্যবসা, কৃষি– সবকিছুর দায় তাদের উপর চাপানো যায়। এটি করে কর্পোরেট পুঁজি নিজে আড়ালে থেকে যায়। আর জনগণ একে অপরের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। রাজনৈতিক ভাবে অধিকার অর্জনের ময়দানে নামতে পারেনা। কারণ তাদের একথা জানতেই দেওয়া হয়না, তাদের অধিকার কে কেড়েছে। এই এত ঢাকঢোল, এত টাকা খরচ, এত পুলিশ-শান্ত্রী, এত অনুপ্রবেশ তত্ত্বের আমদানি, এত গেল গেল রবের পরেও আসামে কী দেখা গেল? আসামের জনসংখ্যার মাত্র ৬ -৭ শতাংশ অনুপ্রবেশকারী (!)। তাহলে প্রচারের এই ঢক্কানিনাদ? হ্যাঁ, তা ছিল আইওয়াশ। সেই কথা পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রেও দীর্ঘদিন ধরে আওড়ে যাওয়া হচ্ছে। স্বাধীনতার পরে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের লড়াইয়ের সময় ১৯৭১ সালে বহু মানুষ পূর্ববঙ্গ থেকে পশ্চিমবঙ্গে আশ্রয় নিয়েছিলেন। সেটা অর্ধ শতাব্দী আগের কথা। তো সেই মানুষদেরকে ধরে ধরে এখন ডিটেনশন ক্যাম্পে পাঠাব? আর তাদের 'ধর্ম'-র হিসেব নিতে গেলে দেখছি তারা বেশির ভাগই হিন্দু। আজও তাদের বোধোদয় হলনা! এদের সংখ্যা ২ কোটি হতে পারে? বোধোদয়ের প্রশ্ন তাদের জন্য নয়। তারা জেনে শুনেই আতঙ্কের পরিসর জিইয়ে না রাখলে মানুষ অধিকারের জন্য সরব হয়ে উঠবেই উঠবে। তাদের তখত ধরে রাখা সম্ভব হবে না। অতএব অনুপ্রবেশের তত্ত্ব না আউড়ালে উপায় নেই। তাদের সমর্থক অনেকেই এর জবাবে জেনে শুনে চুপ করে যায় যে, অবিভক্ত ভারতবর্ষ একটিই দেশ ছিল। ভিন্ন কোনো দেশ নয়। জোর করে রক্ষণকামী ব্রিটিশ ও তার এদেশীয় দোসররা সেই অভিন্ন দেশকে কাঁটাছেড়া করে মানুষের জীবনে কতই না অবর্ণনীয় যন্ত্রণা চাপিয়ে দিয়েছে।

নাগরিকত্বের সাংবিধানিক আইনি অবস্থান

নাগরিকত্ব জন্মস্থান বা ব্লাডলাইনের (রক্ত সম্পর্ক) দ্বারা নির্ধারিত হতে পারে। নাগরিকত্ব হল ব্যক্তি ও রাষ্ট্রের মধ্যে সম্পর্ক। এর শুরু ও শেষ রাষ্ট্র এবং আইনে। তা জনসাধারণে শুরু ও শেষ নয়। নাগরিকত্বের ধারণা মানেই কে নাগরিক নয় তা বাছাইয়ের ধারণা। এবং তাদের বাদ দেবার ধারণা। আগেই বলা হয়েছে নাগরিকত্ব অনুমোদনের দুটি নীতি। একটি হল Jus Soil ও অন্যটি Jus Sanguine। আমাদের দেশে Jus Soil অর্থাৎ জন্মস্থান এবং Jus Sanguine অর্থাৎ রক্তসূত্রের মধ্যে সংবিধান প্রথমটিকে নাগরিকত্বের ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করে। রক্ত সম্পর্কের নীতিটি বর্ণবাদী হওয়ায় পরিত্যক্ত হয়। সংবিধান Citizens বা নাগরিকের সংজ্ঞা না দিলেও আর্টিকেল 5 -11 এর মধ্যে কোন কোন ধরনের মানুষ নাগরিকত্ব পেতে পারে তা সবিস্তারের উল্লেখ করেছে। সংবিধানের অন্যান্য প্রভিশন 26 জানুয়ারি ১৯৫০ কার্যকর হলেও এই ৫-১১ এর ধারাগুলি ১৯৪৯ সালের ২৬ নভেম্বর থেকেই কার্যকর হয়। সংবিধানের ১১ নং ধারায় এই নাগরিকত্ব প্রদান বা বাতিল করার ক্ষমতা সম্পূর্ণভাবে পার্লামেন্টের উপর অর্পণ করা হয়। তাই পার্লামেন্ট সংবিধানের নাগরিকত্বের প্রভিশনের বিরুদ্ধে যেতে

পারে। আইন সংশোধন করতে পারে।

১৯৫৫ সালে নাগরিকত্ব আইন পাশ হয়েছিল, এবং এ পর্যন্ত তা চারবার সংশোধিত হয়েছে– যথাক্রমে ১৯৮৬, ২০০৩, ২০০৫ এবং ২০১৫। এই আইন যে কোনো ব্যক্তির ক্ষেত্রে সন্দেহ হলে তার নাগরিকত্ব নির্ধারণের ক্ষমতা সরকারকে দিয়েছে।

সংবিধানের ৫ নং ধারায় বলা হয়েছে যারা ভারতবর্ষে বসবাস করে এবং যারা ভারতবর্ষে জন্মেছে তারা সবাই ভারতীয় নাগরিক। এমনকি যারা ভারতে বসবাস করে কিন্তু ভারতে জন্মায়নি, তবে বাবা-মায়ের যে কোনো একজন জন্মেছে তারাও ভারতবর্ষের নাগরিক। যেকোনো ব্যক্তি যিনি ৫ বছরের বেশি বসবাস করেছেন, তিনি নাগরিকত্ব দাবী করতে পারেন।

সংবিধানের ৬ নং ধারায় বলা হয়েছে যে বা যারা ১৯৪৯ সালের ১৯ শে জুলাইয়ের আগে ভারতবর্ষে শরণার্থী হিসেবে এসেছে, যাদের বাবা মা অথবা দাদু-দিদি ভারতবর্ষে জন্মেছিল তারা স্বাভাবিকভাবেই নাগরিক হবেন। কিন্তু যারা এই তারিখের পরে এসেছেন তাদেরকে তালিকাভুক্ত হতে হবে।

সংবিধানের ৭ নং ধারায় বলা হয়েছে যারা ১লা মার্চ, ১৯৪৭ র পরে পাকিস্তানে চলে গেছিলো, কিন্তু Resettlement permit র মধ্য দিয়ে ফিরে এসেছিল তারাও নাগরিক।

১৯৮৬ সালের সংবিধান সংশোধনে ৩ নং সেকশন যুক্ত করা হয়। যাতে বলা হয় যারা ২৬ জানুয়ারি ১৯৫০ থেকে ৩১ শে জুন ১৯৮৭ এর মধ্যরাত পর্যন্ত ভারতে জন্মগ্রহণ করবেন তারা জন্মসূত্রেই ভারতীয় নাগরিক। যারা ১ জুলাই ১৯৮৭ এর পর এবং ৪ ডিসেম্বর ২০০৩ এর আগে ভারতে জন্মগ্রহণ করবেন, তারা নাগরিকত্ব পাবেন যদি তাদের বাবা-মার একজন তাঁর জন্মের সময় ভারতীয় নাগরিক হন। এই সংশোধনে জন্মস্থানের নীতি খর্বিত হয়।

২০০৪ সালের সংবিধান সংশোধনে NDA সরকার আগের সংশোধনের নীতিটিকে আরও কঠোর করেন। তাতে বলা হয় যারা ৪ ডিসেম্বর ২০০৩ থেকে পরবর্তীতে ভারতে জন্ম গ্রহণ করেন, তাদের বাবা-মা দুজনকেই ভারতীয় নাগরিক হতে হবে এবং তারা অবৈধ অনুপ্রবেশকারী হবেন না।

Citizenship Amendment Bill ২০১৬ তে প্রস্তাব করা হয় ৬টি সম্প্রদায় যথাক্রমে হিন্দু, শিখ, বৌদ্ধ, জৈন, পারসী এবং ক্রিশ্চিয়ান এর কোনও সদস্য যদি পাকিস্তান, বাংলাদেশ এবং আফগানিস্তান থেকে এদেশে আসে বসবাসের জন্য এবং তারা যদি ১৪ই ডিসেম্বর ২০১৪ এর আগে প্রবেশ করে তবে তাদের নাগরিকত্ব প্রদান করা হবে। সেক্ষেত্রে আগের ছয় বছর তাদেরকে ভারতে থাকতে হবে। এই শরণার্থীদের Passport Act ও Foreigners Act থেকে অব্যাহতি দেওয়া হবে। এই বিল আমাদের সংবিধানের মূল স্পিরিটের এবং সরাসরি মানবাধিকার নীতির বিরোধী।

আসামের স্বাতন্ত্র্য

১৯৮৫ সালে Assam Accord স্বাক্ষরিত হয় বেআইনি অনুপ্রবেশকারীদের বিরুদ্ধে আন্দোলন এর নেতাদের সাথে রাজীব গান্ধী সরকারের। সেই অনুযায়ী ১৯৮৬ সালের নাগরিকত্ব সংশোধনী আইনে আসামে বিশেষ ক্যাটেগরির নাগরিকত্বের সৃষ্টি করা হয়। সংবিধানের ৬ নং ধারায় ৬ এর ক সংযুক্ত হয়। যাতে বলা হয়, যে সমস্ত ভারতীয় নাগরিক ১লা জানুয়ারি ১৯৬৬ সালের আগে আসামে প্রবেশ করেছে এবং বসবাস করেছে তারা ভারতীয় নাগরিক হবেন। কিন্তু যারা ১লা জানুয়ারি ১৯৬৬ এর পরে এবং ২৫ শে মার্চ ১৯৭১ এর আগে আসামে এসে বাস করেছে তাদের বিদেশী চিহ্নিত হবার পর ১০ বছর অতিবাহিত হবার পর তারা নাগরিক হবেন। মধ্যবর্তী সময়ে তাদের ভোটাধিকার থাকবে না।

অর্থাৎ টেকনিক্যালি আসাম বাদে সারা দেশে NRC বা National Registrar of Citizen হলে এখন পর্যন্ত সাংবিধানিক আইনি বিধান হল–

১) ২৬ শে জানুয়ারি ১৯৫০ থেকে ১৯৮৭ এর ১লা জুলাই এর আগে যারা ভারতে জন্মেছেন তারা ভারতীয় নাগরিক।

২) ১৯৮৭ সালের ১লা জুলাই থেকে ২ ডিসেম্বর ২০০৪ এর মধ্যে যারা জন্মাবেন তারা ভারতীয়

নাগরিক হবনে, যদি তাদের বাবা-মার একজন ভারতীয় নাগরিক হন।

৩) ২০০৪ এর পরে যারা জন্মাবেন তাদের বাবা-মা-র দুজনকেই নাগরিক হতে হবে অথবা একজন নাগরিক এবং একজন বেআইনি অনুপ্রবেশকারী না হলে, তারা নাগরিক হবেন।

ন্যাশনাল পপুলেশন রেজিস্টার

২০ জুন ২০১৯ এ রাষ্ট্রপতি তার ভাষণে জাতীয় জনসংখ্যা পঞ্জীর ঘোষণা করেন (National Population Register)। এই অনুযায়ী ১লা এপ্রিল ২০২০ থেকে ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২০ এর মধ্যে National Population Register নির্ধারণ করে জনগণের Place Of Residence দেখা হবে। এতে Demographic Data অর্থাৎ স্থানিক তথ্য এবং Biometric তথ্যও থাকবে। National Population Register ও National Register of Citizen এক নয়। দুটো আলাদা বিষয়। ২০০৩ এর সংবিধান সংশোধনী আইন অনুযায়ী National Population Register হওয়ার কথা।

NRC হলে Document দেখা হবে ৩০ শে জুন ১৯৮৭ এর আগের। কিন্তু কোন কোন ডকুমেন্ট দেখা হবে তা ২০২০ এর NPR এর পরে NRC এর ঘোষণা হলে জানা যাবে।

সারাদেশে NRC -র হুঙ্কার

আসামের ক্ষেত্রে প্রাদেশিক সেন্টিমেন্ট (অসমিয়া বনাম বাঙালি) বহু যুগ ধরে বিদ্যমান সমস্যা। গোটা দেশের অন্য কোনো প্রান্তে কোনো জনপদ কি নিজেরা এই দাবী করেছে? না, করেনি। তৎসত্ত্বেও শাসক দলের তরফে এই হুমকি প্রতিদিনই শোনা যাচ্ছে। পশ্চিমবঙ্গে তার ভিন্ন মাত্রা আছে। তাদের ধর্মভিত্তিক বিভাজনের রাজনীতির অপকৌশলের কাছে বাঙালি ২০১৯ সালের পার্লামেন্টারী নির্বাচনে পরাজিত হয়ে তাদের অনেকগুলি সিট বাংলা থেকে দিয়েছে। কিন্তু ইত্যবসরে দেশের অর্থনীতির যে সংকট তার থেকে উদ্ভূত যে জীবন যন্ত্রণা– অর্থাৎ কর্মহীনতা, কৃষি-শিল্প, ম্যানুফ্যাকচার, ব্যবসা সহ সমস্ত ক্ষেত্রের যে নাভিশ্বাস, বাজারে বিস্কুট থেকে গাড়ি সমস্ত রকম পণ্যের চাহিদা কমে যাওয়া– এর থেকে বাঁচতে শাসক শ্রেণিকে জনতার উপর তো নতুন আতঙ্ক চাপাতেই হবে। NRC জুজু তারই নাম। সেখানে মানুষের প্রতিদিনের জীবনযুদ্ধের সংকটটি চাপা পড়ে গিয়ে যাতে চলে আসে ভোটার কার্ড, রেশন কার্ড, আধার কার্ড, জমির দলিল নিয়ে ছুটোছুটি। সেই ছুটোছুটি কি শুরু হয়নি?

শুরু তো হয়েইছে। ভয়ানক ভাবেই হয়েছে। রাজ্যে এপর্যন্ত যার বলি ১৩ জন মানুষ। যাদের কেউ হার্ট অ্যাটাকে মারা গেছে, কেউবা সুইসাইড করে। উত্তরবঙ্গ থেকে কলকাতা সর্বত্র।

লক্ষ্যণীয়, এই আতঙ্কের পরিবেশে হিন্দু-মুসলিম ভেদ গেছে ঘুঁচে। হিন্দুদের এই প্রক্রিয়ায় বাদ যাওয়া লোকেদের Citizenship দেওয়া হবে, বোধকরি সেই অপপ্রচার আর কাজ করছে না। কারণ, আসামের ক্ষেত্রে দেখা গেছে ১৯ লক্ষ তালিকা ছুটের মধ্যে বেশির ভাগই হিন্দু। Citizen Amendment Bill না হয় পাশ হল। আইন হল। পাকিস্তান-আফগানিস্তান-বাংলাদেশ থেকে শরণার্থী হিসেবে যারা এদেশে বিভিন্ন সময় এসেছে তাদের কি নাগরিকত্ব দেওয়া হবে? তার প্রক্রিয়া কী? তাদের আনা বিল এ তার যে প্রভিশন, তাতে তাদের কে প্রমাণ করতে হবে যে তারা ওদেশ থেকে বিতাড়িত হয়ে এসেছে। কীভাবে তারা তা প্রমাণ করবে?– সেই প্রমাণের কড়াকড়ি যদিও কমানো হল – যতদিন তারা কাগজপত্র নিয়ে অফিস-আদালত আর ডিটেনশন ক্যাম্পে ছুটোছুটি করবে, ততদিনে তার পরিবারের কী হবে? মানবতার সংকট একে বলব না তো কী বলব? তাই যে বাঙালির চেতনায় পল্লবিত রোমান্স যাকে 'অস্তিত্ব' বিশেষভাবে বিশেষ ইতিবাচক সংজ্ঞায় সূত্রায়িত করেছে, তা কি এই ভুঁইফোড় যক্ষ-রক্ষের বিভাজনী পলিটিক্স ধরতে ব্যর্থ হবে? যদি হয় –নরক তখন নিত্যদিনের সঙ্গী। যে নরকসঙ্গ আসামের ৩.৫ কোটি জনতা টের পাচ্ছে আজ হাড়ে-হাড়ে, মজ্জায়- মজ্জায়, মর্মে মর্মে।

বিরোধী রাজনীতির অঙ্ক

নীতিশকুমার, মমতা ব্যানার্জী তাদের রাজ্যে NRC এর প্রয়োজনীয়তা নেই আগাম কেন্দ্রকে জানিয়েছে। কিন্তু তারা জানাল আর কেন্দ্র তা মেনে নিল ব্যাপারটি

এত সোজা নয়। তাই মমতাকেও রাজ্যে মিছিল করতে হয়েছে। আতঙ্ক কমছে না। অন্যান্য বিরোধী দল তাদের রাজনৈতিক ভোট বৈতরণীর হিসেব কষছে। সিপিএম ও কংগ্রেসকে এখনো পর্যন্ত NRC বিরোধী বড় কোন উদ্যোগ নিতে দেখা যায় নি। এমনকি দিল্লিতে প্রধান বিরোধী দল হিসেবে রাস্তার রাজনীতি থেকে তারা টুইটার নিয়েই শুয়ে পড়েছে। ফলে সেখানেও মানুষের আশা-ভরসার কোন জায়গা দেখা যাচ্ছেনা।

প্রতিকারী পদক্ষেপ

রক্ষণকামী অপশক্তির আতঙ্ক ছড়ানোয় আতঙ্কিত হয়ে মানুষ সে আতঙ্ক জয় করতে পেরেছে, এমন কোনো দৃষ্টান্ত মানবজাতির ইতিহাসে নেই। তাই রক্ষণকামী শক্তির বিভাজনের রাজনীতি অনুধাবন করতে হবে। মিডিয়া ও সোস্যাল মিডিয়ার মিথ্যাচারের বিপরীতে শাসক শ্রেণির অভিসন্ধি সম্পর্কে সম্যক বোধের জাগরণ ঘটানো ছাড়া পথ নেই। আর তা করতে গেলেই — ১। খণ্ড খণ্ড করে নয়, জীবনকে, সমাজকে এবং জীবন তথা সমাজের শত্রু-মিত্র চিহ্নিত করার অখণ্ড বস্তুবিজ্ঞানের নীতি নিয়ম জীবনে প্রয়োগ করে সংস্কৃতিগত রাজনীতির অভ্যুদয় ছাড়া উপায় নেই। ২। সেই পথে অগ্রসর হবার আশু উদ্যোগের একটি বাঙালি চেতনার জাগরণে হিন্দু-মুসলিম সেন্টিমেন্টের বিভাজন আটকানো। ৩। দুপক্ষের সেন্টিমেন্টকে বিপথগামী করার শক্তিকে চিহ্নিত করা। ৪। তাকে আর্থসমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন করার আন্দোলন শুরু করা অতীব প্রয়োজন।

তথ্যসূত্র:

1. ইণ্ডিয়ান এক্সপ্রেস, ৩১ আগষ্ট ২০১৯, Assam NRC; Who is an Indian Citizen? How is it Defined?- Faizan Mustafa.
2. ভারতের সংবিধান পরিচয় — দুর্গাদাস বসু।

শিশুর পুষ্টি ও বৃদ্ধিতে রক্ষণকামিতার কালো হাত

রাষ্ট্রপুঞ্জের বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচি ভারতের পরিসংখ্যান ও কর্মসূচি রূপায়ণ মন্ত্রকের (Ministry of Statistics and Programme Implementation) সহায়তায় সম্প্রতি একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে। প্রকাশিত প্রতিবেদনে জানা যাচ্ছে চলতি হার বজায় থাকলে ২০২২ সালের মধ্যে দেশের প্রতি তিনজন শিশু পিছু একজন খর্বাকৃতির (Stunted Growth) হবে।

শিশুর খর্বাকৃতি পরিমাপ আসলে শিশুর ক্রনিক অপুষ্টির পরিমাপ। এই সমস্যা গত দশকে প্রতি বছর ১ শতাংশ হারে কমেছে। এটি ভারতের মতো উন্নয়নশীল অর্থনীতির পক্ষে অত্যন্ত কম হার। এই হারে কমলে ২০২২ সালের মধ্যে সারা দেশে ৩১.৪ শতাংশ শিশু খর্বাকৃতির থাকবে। এই প্রতিবেদন ভারতকে অবশ্যই উল্লিখিত সময়ে ২৫ শতাংশ হারে লক্ষ্যমাত্রা পূরণের কথা উল্লেখ করেছে।

গত দু-দশকে ভারতে খাদ্য শস্যের ফলন ৩৩ শতাংশ বেড়েছে। যা প্রতিবেদন অনুযায়ী ২০৩০ সালের ফলন লক্ষ্যমাত্রার অর্ধেক। যাই হোক দেশ খাদ্য সুরক্ষাধীন। ভারতীয় কৃষক যে হারে ফসল ফলাচ্ছে তা আগে কোনো কালে হয়নি। কিন্তু সেই একই হারে ভোক্তার কাছে চাল, গম ও অন্য শস্যের প্রাপ্তি ঘটছে না—জন সংখ্যা বৃদ্ধি, অসাম্য, খাদ্যের অপচয় এবং রপ্তানীর কারণে । ফলত খাদ্য পুষ্টির মাথাপিছু গড় ক্যালরি ভোগ দরিদ্রতম ৩০ শতাংশ জনগণের ক্ষেত্রে ১৮১১ কিলো ক্যালরি। যা হওয়া উচিত ২১৫৫ কিলো ক্যালরি। পুষ্টিগত এই কমতি হারের পরিণাম সবচেয়ে প্রকটভাবে দেখা যায় শিশুদের মধ্যে । বিহার ও উত্তর প্রদেশে যথাক্রমে ৪৮ শতাংশ ও ৪৬ শতাংশ। অর্থাৎ প্রায় প্রতি দুজন শিশু পিছু একজন খর্বাকার। যেখানে কেরালা ও গোয়ায় প্রতি ৫ জনে ১ জন খর্বাকার (২০ শতাংশ)। অপুষ্টিজনিত খর্বাকার বৃদ্ধির উচ্চহার দেখা যাচ্ছে সম্পদ বন্টনের নিরিখে দেশের দরিদ্র্যতম ৫১ শতাংশ মানুষের মধ্যে। তপশিলিভুক্ত জনগণের ৪৩.৬ শতাংশের মধ্যে এবং তপশিলি আদিবাসিদের ৪২.৫ শতাংশের মধ্যে এই উচ্চহার দেখা যায়। সার্বিকভাবে শিক্ষাহীন মায়েদের ক্ষেত্রে অপুষ্টিজনিত খর্বাকার শিশুর জন্মহার ৫১ শতাংশ।

প্রতিবেদন থেকে পাওয়া তথ্যে এটা পরিষ্কার যে, ভারতের মানুষের জন্য প্রয়োজনীয় পুষ্টিগুণ সম্পন্ন খাদ্যের উৎপাদনগত ঘাটতি নেই। তা সত্ত্বেও প্রতিবছর অপুষ্টিজনিত কারণে খর্বাকৃতির জন্ম প্রায় ৩০ শতাংশ। তবে কেন এই ক্রনিক ডিজিজ? প্রতিবেদনটি কিছু কারণের কথা বলেছে। যেমন— জনসংখ্যা বৃদ্ধির কথা বলেছে। এই কথাটি উৎপাদনী শ্রমবিজ্ঞানের নিরিখে ভুল। কেননা উৎপাদনে সক্ষম ব্যক্তির সংখ্যা যত বেশি অর্থাৎ মানবশক্তি যতবেশি উৎপাদন তত বেশি। মানবশক্তি যত কম উৎপাদনও তত কম।

আরেকটি কারণ তারা বলেছে অসাম্য। কীসের অসাম্য? সম্পদের উপর নিয়ন্ত্রণ ও অধিকারের অসাম্য। ব্যক্তি ৮ ঘন্টা শ্রম দিয়েও যদি তার দেহগত পুষ্টির চাহিদাজনিত খাদ্য না পায়, সেই অসাম্য, মানে শ্রমমূল্যের অসাম্যের কথায় তারা বলেছেন। সারাদিন শ্রম দিয়ে কেন সে তার শ্রমমূল্য যথার্থ তো দূরের কথা, শরীরের বিকাশের জন্য আবশ্যিক মূল্যেরও অনেক কম পাচ্ছে তা বুঝতে গেলে আমাদের দেশের শ্রম ও শ্রমমূল্যনীতির বৈশিষ্ট্য জানা অতীব প্রয়োজন। ভারতের অর্থনীতি চলে বাজারি ব্যবস্থাপকের কব্জায়। যাকে বলে বাজার অর্থনীতি। আর বিশ্বায়নী ব্যবস্থা এর সাথে যুক্ত হয়ে এর নাম ১৯৯১ এর পর থেকে হয়েছে মুক্তবাজার অর্থনীতি। বস্তুবিজ্ঞানের ভাষায় একে বলা হয় অনিয়ন্ত্রিত গণেশী অর্থনীতি। এই নীতি নামক অনীতি বা দুর্নীতিটি কীভাবে চলে? না, এখানে যারা উৎপাদনী শ্রমের সাথে যুক্ত অর্থাৎ মূল্য উৎপাদন করে তারা উৎপন্ন মূল্যের দাম বা মূল্যমান নির্ধারণ করতে পারে না। আমাদের দেশের সরকারও পারে না। তা নির্ধারণ করে বিশ্বের বহুজাতিক কর্পোরেট সংস্থার মালিকরা। তারা তাই তাদের মুনাফা বজায় রাখে ফাটকাবাজারের সংক্রমণের মাধ্যমে। ফলত

রক্ষণকামী গণেশী অর্থনীতির ব্যবস্থাপনায় তাদের মূল্যকুক্ষি প্রতিদিন এত হারে বৃদ্ধি পায়, যা সাধারণের কল্পনার অতীত। মূল্যকজ্বা হয়ে গেলে তার সামাজিকীকরণ ঘটে না। ফলে অর্থনীতিও সরল নিয়মে চলতে পারে না। সেখানে অনেক জটিলতা চলে আসে। সেই জটে গণমানস দিনরাত শ্রম দিয়েও যে তিমিরে ছিল, তার থেকে আরো তিমিরে চলে যায়। নিজসহ পরিবারের প্রয়োজনীয় আবশ্যিক মূল্যই সংগ্রহ করতে পারে না। পরিণামে তাদের নিজেদের শরীরের বিকাশ সুস্থ ও স্বাভাবিকভাবে হয় না। তারা অপুষ্টিতে ভোগে, তাদের উত্তর প্রজন্মও সেই সংক্রমণের শিকার হয়। পঙ্গুত্ব, অসুস্থ, অপুষ্ট, খর্বাকার – প্রভৃতি নিয়ে জন্ম গ্রহণ করে।

তাৎক্ষণিক ট্রিপল তালাক বিরোধী আইন

দেশে তাৎক্ষণিক ট্রিপল তালাক প্রথা নিষিদ্ধ করা হয়েছে। ২০১৯ সালে ভারতে এই প্রথা নিষিদ্ধ ও আইনত দণ্ডনীয় অপরাধ হিসেবে বিবেচিত হবার বহু আগেই পৃথিবীর প্রায় বেশির ভাগ মুসলিম অধ্যুষিত দেশে এই প্রথা নিষিদ্ধ হয়েছে। হিন্দুস্তান টাইমস ১৯ সেপ্টেম্বর, ২০১৮ তারিখে তাদের প্রতিবেদনে জানায় নিমোক্ত দেশগুলি এই প্রথা ব্যান করেছে–

ক্রমিক নং	**দেশের নাম**	**সাল**
০১	পাকিস্তান	১৯৬১
০২	বাংলাদেশ	
০৩	শ্রীলঙ্কা	১৯৫১
০৪	আফগানিস্তান	
০৫	তুরস্ক	
০৬	সাইপ্রাস	
০৭	টিউনিসিয়া	১৯৫৬
০৮	আলজিরিয়া	
০৯	মালেশিয়া	
১০	জর্ডন	
১১	মিশর	১৯২৯
১২	ইরান	
১৩	ইরাক	
১৪	ব্রুনেই	
১৫	আরব আমির শাহী	
১৬	ইন্দোনেশিয়া	১৯৭৪-৭৫
১৭	লিবিয়া	
১৮	সুদান	
১৯	লেবানন	
২০	সৌদি আরব	
২১	মরক্কো	
২২	কুয়েত	

এই বিবাহ বিচ্ছেদ প্রথায় তাৎক্ষণিকভাবে দাম্পত্য সঙ্গীর পুরুষটি তার দাম্পত্যসঙ্গীকে তাৎক্ষণিক তিনবার তালাক কথাটির উচ্চারণের মাধ্যমে দাম্পত্য বিচ্ছেদ ঘটাতে পারে। পরিণামে নারীটি অসহায় অবস্থায় পড়ে। এখন প্রশ্ন হল ইসলামের দাম্পত্য ব্যবস্থার সাথে বিচ্ছেদ সংক্রান্ত এই প্রথা কবে, কখন, কোথায়, কীভাবে যুক্ত হয়ে পড়ল? ইসলামের সামগ্রিক জীবন ব্যবস্থা সম্পর্কিত মৌলিক সূত্রের উত্থাপন ব্যতিরেকে তা কি জানা সম্ভব? ইসলামের নামে চালু থাকা হাজারো লাখো উদ্ভট, কিম্ভূত কিংবা নারকীয় ব্যাপার সমূহ কি ইসলাম তথা আলকোরানিক জীবন দর্শনের নির্দেশিত পন্থা, নাকি পৃথিবীর প্রতিটি অতীত জ্ঞান-দর্শনের ক্ষেত্রে যা প্রযোজ্য, তা ইসলামের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য? অর্থাৎ রক্ষণকামী ক্ষমতাতন্ত্র সেই জীবন-দর্শনকে বিকৃত, খণ্ডিত, খর্বিত করে তার দফারফা করেছে। এই আলোচনা ব্যতীত ট্রিপল তালাকের মতো বিকৃতির সংক্রমণের হদিস, তার কারণ, তার উৎপত্তি ও তার ধ্বজাধারী কারা সে সম্পর্কে সম্যক জানা যায় না।

ইসলামের আর্থসামাজিক প্রযুক্তি ও তা অকেজোকরণ

ইসলামের আর্থসামাজিক প্রযুক্তির বাস্তবায়ন ইতিহাস স্রষ্টা হজরত মুহাম্মদ (সঃ) এর মক্কা বিজয়ে। তাঁর দেহত্যাগের পর তাঁর চার সহযোগী যথাক্রমে হজরত আবুবকর, হজরত ওমর, হজরত ওসমান ও হজরত আলি সেই আর্থসামাজিক কৃৎকলা প্রয়োগ করেন। কিন্তু মক্কাবিজয়ের অব্যবহিত পর থেকে ঘাপটি মেরে যাওয়া আবু সুফিয়ানি রক্ষণকামিতা দ্বিতীয় খলিফার সময় থেকেই তার জারিজুরি আরম্ভ করে দেয়। ষড়যন্ত্রের সাতকাহনে একে একে তিন খলিফা নিহত হলেন। ৬৬১ খ্রিস্টাব্দে মোয়াবিয়া ক্ষমতা দখল করল। ইসলামের আর্থসামাজিক প্রযুক্তি অকেজো হয়ে গেল। পৈত্রিক ক্ষমতার বিষবীজের মধ্যে দিয়ে নির্বাচনের নীতি হারিয়ে গেল। তার ছেলে ইয়াজিদ কারবালার নৃশংস যুদ্ধে হোসেনকে হত্যার মধ্যে দিয়ে সেই ক্ষমতার পাকাপাকি ফ্ল্যাগ উত্তোলন করল। এ ইতিহাস তো অস্তিত্বের জবানিতেই জানা। সমকাল গবেষকদের গবেষণা থেকেও জানা যাচ্ছে রাজবংশগত (Dynastic) ও সাম্রাজ্যিক ঐতিহ্যগত ইসলামের

প্রচলন করল এরাই। যাতে ইসলাম হয়ে গেল তাদের কাছে প্রথা পালনের অতীতে মানুষকে বন্দি করার তথাকথিত ধর্ম-ফাঁদ। এই ফাঁদে আষ্টেপৃষ্ঠে মানুষকে জড়িয়ে দিতে খাড়া করা হল কতই না নতুন নতুন আনুষ্ঠানিকতার জাঁক-জমক, মানুষের অধিকার বোধ, অধিকার প্রতিষ্ঠার জ্ঞান-দর্শনকে বস্তাবন্দী করে ক্ষমতার একমুখীন দাপটে জাকাত আদায়হীন, সালাত কায়েমহীন, আর্থসমাজে তা ধর্মতন্ত্র হিসেবে জেঁকে বসল। এভাবেই রক্ষণকামিতা ইসলামের আর্থসামাজিক প্রযুক্তি অকেজো করে দেবার চক্রান্ত করল। সেই ঐতিহ্যিক ইসলামের নামে, আইনের নামে, শাস্ত্রের নামে, সুন্নাহের নামে, শারিয়ার নামে কতই না অন্ধকারের ফেরেববাজি। যে ফেরেববাজিতে মানুষের ব্যক্তি জীবন, সমাজ জীবন সবটাই এক একটা হেঁয়ালিতে পর্যবসিত হয় গেল। কোরানিক বস্তুগত দাম্পত্য তত্ত্বের গবেষণাহীন এই রক্ষফাঁদে পড়ে যাওয়া মানুষরা যুগে যুগে মুসলমান নামে পৃথিবীর জনপদে পরিচিত হতে থাকল বটে, কিন্তু এই ফাঁদ কারা কীভাবে পাতল তার অন্ধি সন্ধি আজও খুঁজে পেলনা। রক্ষণকামি ছক্কা পাঞ্জায় এই ক্ষমতা নারীকে বন্দি করল। আলকোরানের 'ঘর' ও 'পর্দা' তত্ত্ব অর্থাৎ যথাক্রমে জীবনায়নী শৃঙ্খলা ও সীমালঙ্ঘন না করার বস্তু ইঙ্গিতকে অপকাজে লাগিয়ে জড়দাম্পত্যের বিষে সমাজকে সংক্রামিত করল। আর কী করল? মানব জীবনের লক্ষ্যকেন্দ্রিক কলেমা, সাউম, সালাত, হজ ও জাকাতকে প্রথাবদ্ধতায় তো আগেই বেঁধে ফেলেছিল, যা থেকে জীবনের সমস্যা সমাধানী ভাবনা চিন্তা অর্থাৎ আমিত্ব কর্ষণ বা চেতনা কর্ষণের কোনো তাগিদ মানুষের মধ্যে থাকল না। যার পরিণামে প্রি-ইসলামিক নানা প্রথা আইনশাস্ত্রের নামে কাজিদের মাধ্যমে, তথাকথিত হাদিসওয়ালাদের মাধ্যমে জীবনকে সংক্রামিত করল। যার অন্যতম এই 'তাৎক্ষণিক' তিন তালাক প্রথা।

আলোকোরানে বিবাহ বিচ্ছেদ পদ্ধতি

বিবাহ হল ফার্ম বণ্ড। বিচ্ছেদ ঘৃণ্য । কিন্তু অশান্তি এড়াতে বিচ্ছেদের বিধান আছে। দাম্পত্য প্রেম-ই বিবাহের ভিত্তি (30:21)। অনিবার্য হলে বিবাহ বিচ্ছেদ। কিন্তু তা হতে হবে সমাজের মধ্যস্থতায় (4:35)। দ্রুত বিচ্ছেদ এড়াতে আলোকোরান দুটি পদ্ধতির বিধান দেয়। ১। বিচ্ছেদ সম্পূর্ণ হতে গেলে তিন মাসের দুটি ওয়েটিং পিরিয়ড নির্ধারণ করে দেয়। ২। যৌন সংসর্গ না করার শপথ নিলে তা ভাঙতে 4 মাস (2:226)। ইসলাম পূর্ব সময়ে আরবে যথেচ্ছ নারী গ্রহণ ও বর্জন প্রথা চালু ছিল। তা হত ব্যক্তি ও গোত্রের ইচ্ছা অনুযায়ী। আল কোরান এই বিচ্ছেদ (Repudiation) তিনবারে সীমাবদ্ধ করে দেয়। চারটি অধ্যায়ে Divorce এর বিষয়টি আছে। সাধারণ নিয়মটি আছে 2:231 এ– নির্দিষ্ট সময় অতিক্রান্তে তাদের গ্রহণ বা বর্জন ভালভাবে করা যাবে। কোনরূপ প্রতিহিংসা অবিচার হবে। 'Khul' বিচ্ছেদ পদ্ধতিরও নির্দেশ করা হয়েছে। এই পদ্ধতিতে নারী নিজেই বিবাহ বিচ্ছেদ প্রক্রিয়া শুরু করতে পারে। এই রকম বিচ্ছেদের ক্ষেত্রে সহমতের ভিত্তিতে এগোতে হবে (2:228-229)।

তথাকথিত আইন শাস্ত্রের Divorce নিয়ম

ইতিহাসের নথিতে তালাক খুব কম দেখা যায়। Khul বা Mutual Divorce বেশি।

তালাক বা বিচ্ছেদ দুই ধরনের–

১। তালাক আল সুন্নাহ–যা রাসুলের শিক্ষানুযায়ী। এটি আবার দুভাগে বিভক্ত–

ক) তালাক আল আহসান– এটি খুব কম অনুমোদন করা হয়। এক্ষেত্রে একবারই উচ্চারণ করা হয় এবং উচ্চারণের বা ঘোষণার পর অপেক্ষমান সময় পর্যন্ত যৌনতা থেকে বিরত থাকা হয়।

খ) তালাক আল হাসান– এক্ষেত্রে তিনটি উচ্চারণমূলক ঘোষণা থাকে দাম্পত্য সঙ্গীর দেহগত শুদ্ধতার সময়ের হিসেবে এবং এই সময়ে যৌন বিরতি থাকবে।

২। তালাক আল বিদাহ– যা রাসুলের শিক্ষা থেকে বিচ্যুতি। এক্ষেত্রে কোনরূপ ওয়েটিৎ পিরিয়ড মেনটেন করা হয় না এবং তৎক্ষণাত তালাক কার্যকর হয়। এর আওতায়ই Initial Tripple তালাক পড়ে। (J. L. Esposito)।

২ নং পদ্ধতি আসলে Pre- Islamic এবং Quranic

নীতি থেকে বিচ্যুতি। কিন্তু এই সমস্ত তথাকথিত juris-prudence বা আইনশাস্ত্র এই বিচ্ছেদপ্রথাকে আইনগত সিদ্ধ হিসেবে গ্রহণ করে। কিন্তু তথাকথিত ট্রাডিশনওয়ালাদের তথ্য থেকেই জানা যায় রাসুলুল্লাহ এই পদ্ধতি বাতিল ঘোষণা করেছিলেন এবং হজরত ওমর এর অনুসারীদের শাস্তিরও বিধান দিয়েছিলেন। (J. L. Esposito)।

তালাক বা বিচ্ছেদের আরেকটি ধরন হল— Delegated Talaq (Tafwid) অর্থাৎ প্রতিনিধিমূলক বিচ্ছেদ ব্যবস্থা। এক্ষেত্রে বিবাহের সময় শর্তসহ অথবা শর্তছাড়া নারীর উপর বিচ্ছেদের ভার অর্পণ করা হয়। এটাকে তালাক আল তাফাউদ বা তাফইদ বলে।

তালাক 'খুল' বা 'খুলা' অর্থাৎ Mutual Divorce যা আল কোরানে 2:228 এ উল্লিখিত।

Judicial Divorce বা কাজীর কাছে আবেদনের মাধ্যমে বিচ্ছেদের নিষ্পত্তি করার বিধান আছে। এই আবেদন নির্দিষ্ট গ্রাউণ্ডে করতে হয়। বিভিন্ন আইনি স্কুল এক্ষেত্রে বিভিন্ন গ্রাউণ্ড সেট করে। দোষ নির্ধারণ করে নিষ্পত্তি করা হয়। প্রথমে আপস মীমাংসার (Reconciliation) চেষ্টা করা হয়, না হলে বিচ্ছেদ ব্যবস্থা করা হয়।

শপথ (Oath)

এই আইনশাস্ত্রের বিধানে তিন ধরনের শপথের মাধ্যমে দাম্পত্য সঙ্গীর নর বিবাহ বন্ধন ছিন্ন করতে পারে।

১। The Oath of Continence বা আত্মসংযমের শপথ। এর আওতায় পড়ে ইলা (Ila) ও ইজহার (Izhar)। প্রথম ক্ষেত্রে অর্থাৎ ইলা এর ক্ষেত্রে যদি দাম্পত্য সঙ্গীর নর 4 মাসের জন্য যৌন সম্পর্ক থেকে বিরত থাকার ঘোষণা দেয় এবং তা পালন করে তাহলে বিচ্ছেদ সম্পন্ন হয়ে যায়।

যদি দাম্পত্য সঙ্গীর নর ঘোষণা করে যে তার দাম্পত্য সঙ্গী তার মায়ের মতো, তাই তার সাথে যৌনতা নিষিদ্ধ। এই শপথ ভাঙা যায় এবং বিবাহ টিকে থাকে। এটির নাম ইজহার বা জিহার (Izhar বা Zihar)।

২। পিতৃত্ব প্রত্যাখান (Denial of Paternity) বা Ilan। এক্ষেত্রে দাম্পত্য সঙ্গী সন্তানের পিতৃত্ব প্রত্যাখান করে। দাম্পত্য সঙ্গীর নারী শপথ নিতে পারে ইনফিডিলিটি (Infidelity) প্রত্যাখানের। এবং দুজনেই যদি তাদের শপথে স্থির থাকে তাহলে বিবাহ বিচ্ছেদ হয়ে যায় একজন বিচারকের মাধ্যমে এবং তারা আর কখনও পুনর্বিবাহ করতে পারেনা।

এই দুই ধরনের বিচ্ছেদ সম্পর্কে আলকোরানের 2:226-227 এবং 58:2-4 এ উল্লেখ আছে। এতে দেখি এগুলি প্রি-ইসলামিক রীতি।

৩। শর্তাধীন তালাকের শপথ

দাম্পত্য সঙ্গীর নর ঘোষণা করে যে তার সঙ্গী অমুক কাজ করলে সে তাকে Divorce দেবে।

অতঃপর

খণ্ড বিখণ্ড হাজারো গোষ্ঠী ধারণার প্রি ইসলামিক আরবের সমাজ। তাদের সামাজিক রীতিও সেই ধারণাপ্রসূত জগৎ এরই। এই রীতি অর্থাৎ social custom গুলির কতকগুলিকে সরাসরি নিষিদ্ধ আর কিছুকে পরিশীলিত রূপে আলকোরান তার বিধানে উল্লেখ করে। এবং "What little authentic evidence is available shows that the Ancient Arab System of Arbitration, and Arab customary law in general, as modified and completed by the Quran, continued under the first successors of the prophet, the Caliphs of Median . (A.D 632-661)।" যোসেফ স্যাখট তাঁর Introduction to Islamic Law গ্রন্থে উল্লেখ করেন।

তাহলে যে প্রথা-রীতিগুলিকে আলকোরান বাতিল ঘোষণা করেছিল সেগুলি কেমন করে সমাজের মধ্যে জায়গা করে নিল? এটি করতে পারেনি ৬৩০-৬৬১ পিরিয়ডে। এটি ঘটেছে উমাইয়া শাসন আমল থেকে পরবর্তী দীর্ঘ যুগ ধরে। ক্রমশ ইসলামের আর্থসামাজিক প্রযুক্তিকে অকেজো করার চক্রান্তের মাধ্যমে তাকে প্রথা পালনরূপ ধর্মে পর্যবসিত করার মধ্য দিয়ে। যাতে কতই না বিকৃতিকে ইসলামের নামে বৈধতা দেওয়া হয়েছে তার ইয়ত্তা নেই।

বাস্তবানুগ দাম্পত্য বিধানে দাম্পত্য-সমস্যার সমাধান

মহাভাষ্য সহ পৃথিবীর সমস্ত জ্ঞান-ভাষ্যের সমকাল

প্রায়োগিক দিশা নির্ণায়ক 'অস্তিত্ব' দর্শন প্রণীত গাইডলাইনে দাম্পত্য প্রযুক্তি বাস্তবায়ন ছাড়া ইতিহাসের ভূষি হাতড়ে কোন লাভ নেই। সেই বস্তুবিজ্ঞানের সূত্রে বাস্তবানুগ দাম্পত্য গঠন ছাড়া সেই ভূষি হাতড়ে জীবনকে সুন্দর করা যায় না। সেই লক্ষ্যেই 'অস্তিত্ব' এর বস্তুগত দাম্পত্য প্রযুক্তির প্রাসঙ্গিক কয়েকটি সূত্রঃ—

১। দাম্পত্য গঠনে পরিণয়ের বয়স নির্ধারণ।

২। পরিণয়ে প্রেমকে মূল্য দিয়েও আর্থসামাজিক প্রতিবন্ধকতা প্রতিরোধে Marriage Medical Board স্থাপন।

৩। দাম্পত্য সঙ্গীর কেউ কারো ব্যক্তি মালিকানার সম্পত্তি নয়। কিন্তু কর্তৃত্বের প্রশ্নে নৈর্ব্যক্তিক ব্যক্তিত্বই কর্তৃত্বের দাবিদার।

৪। দাম্পত্য জীবন ভোগে আরো বেশি বাচক অর্থ অর্থাৎ জড়ভোগ পরিত্যাজ্য। উৎপাদিত মূল্যের প্রয়োজনের অতিরিক্ত আর্থসামাজিকীকরণে দাম্পত্যসঙ্গীর উদ্যোগ।

৫। বস্তুগত ব্যক্তিস্বাতন্ত্রের চর্চার মধ্যে দিয়ে দাম্পত্যকে তরতাজা রেখে আর্থসামাজিক ও সত্তাগত নারদ-দুর্বাসা প্রতিরোধ করা। যাতে শুভদৃষ্টিসহ বস্তুগত দাম্পত্য অনুশীলনে দম্পতি আরো বেশি সৃষ্টিশীল হয়ে উঠে।

৬। দম্পতির পরস্পরকে শ্রম স্পৃহার চর্চায় উৎসাহিত করা।

৭। দাম্পত্যে সামাজিক সুজঁল চোখ প্রতিরোধে দুর্বাসা সনাক্ত করে আর্থসামাজিক সমস্যা সমাধানে দম্পতির ন্যায়-প্রযৌক্তিক অংশ গ্রহণ।

৮। দাম্পত্য দুর্বাসা প্রতিরোধে তথা দাম্পত্য সমস্যা সমাধানে বাস্তবানুগ পরিবার সমিতির প্রযুক্তি প্রয়োগ করা।

সূত্র

1. Austitwa, Guidance Foundation, Park Street, Kolkata-17.

2. Al Quran – Trans. Maulana Muhammad Ali, 2002, Ahmadiyya Anjuman, USA.

3. Women in Islamic law – J. L. Esposito.

4. An Introduction to Islamic law – Joseph Schacht. Oxford University Press-1982.

5. Wikipedia.

রাষ্ট্রপুঞ্জের পরিবেশ সম্মেলনে গ্রেটা থুনবার্গের চ্যালেঞ্জ

বিগত ২১ সেপ্টেম্বর ২০১৯, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কে বিশ্ব পরিবেশ ও জলবায়ুর সমস্যা বিষয়ক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হল। এই জলবায়ু ও পরিবেশ বিষয়ক সম্মেলন প্রতি বছরই হয়ে থাকে। এটা নতুন কিছু নয়। সম্মেলনের কর্মসূচি কখনোই ফলো করেনা বেশির ভাগ উন্নত দেশগুলি। তারা মূলত উন্নয়নশীল ও অনুন্নত দেশের উপরই পরিবেশ নিরাপত্তার দায়ভার চাপিয়ে দেয়। তবে এই বছরের সম্মেলন, বিগত বছরগুলির থেকে একটা ভিন্নমাত্রা লাভ করেছে। সভায় ১৬ বছরের সুইডিস তরুণী গ্রেটা থুনবার্গ সেই প্রশ্নই করেছে, বিশ্বের বড় বড় দেশের রাষ্ট্রনায়কদের মুখের উপর। তিনি বলেন, 'How dare you?' তোমাদের এত দুঃসাহস কী করে হল? তোমরা আমার শৈশব নষ্ট করে দিয়েছো (তরুণীটি নিজে অ্যাসপারগার সিন্ড্রোম নামক স্নায়ুবিক জটিল রোগে আক্রান্ত)। তোমরা এইরূপ সম্মলনে কেবল ফাঁকাবুলি আওড়াও। কাগজেই তা সীমাবদ্ধ থাকে। পরিবেশ ধ্বংসকারী পদার্থগুলির উপর নিয়ন্ত্রণের মাত্রায় কোনো হেরফের হয় না। আমার মতো অগণিত শিশু আজ বিভিন্ন শারীরিক, মানসিক প্রতিবন্ধকতার শিকার। তারা তাদের শৈশব, যৌবনকে ভোগ করতে পারে না। তার বক্তব্যের মূল পয়েন্ট হল—

১। পরিবেশ বিষয়ক সভায় দেওয়া প্রতিশ্রুতি কোনো দেশই মেনে চলে না।

২। সম্মেলনকারী রাষ্ট্রনেতারা সাধারণ জনগণকে কিছু মনে করেনা। ক্ষমতার আস্ফালন করে।

৩। সব রাষ্ট্রই কেবলমাত্র অর্থনৈতিক মুনাফাতেই জোর প্রদান করে, পরিবেশের ক্ষতির দিকে নজর দেয় না।

৪। রাষ্ট্রের এত দুঃসাহসের জবাব আমরা দেব।

৫। আমাদের মতো ছাত্র-ছাত্রীদের এই আন্দোলনে আসতে হচ্ছে। বড়োরা কোনো প্রশ্ন ও আন্দোলনে আসে না। — প্রভৃতি।

গ্রেটা বিশ্বের দরবারে বড় প্রশ্ন উত্থাপন করেছে। তার প্রশ্নের বাস্তবতা আমরা সব দেশের নাগরিকই মর্মে মর্মে টের পাচ্ছি। আজকে মাটি, জল, বায়ু, পাহাড়-পর্বত, নদী, সমুদ্র, বন-অরণ্য, জলাভূমি, হ্রদ, পশু-পাখি, প্রাণী-উদ্ভিদ— ইত্যাদি সকল প্রাকৃতিক সম্পদই ধ্বংস হচ্ছে। যার পরিণামে প্রকৃতির স্বাভাবিকতা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। প্রাকৃতিক ভারসাম্য হারিয়ে যাওয়ার পরিণামে মানুষের উপর তার চরম পরিণাম নেমে আসছে। বায়ু মণ্ডলের উপাদানগুলি আজ বিষাক্ত হয়ে যাচ্ছে। তাই যখন বর্ষা হওয়ার কথা তখন হচ্ছে না। অন্য সময়ে হচ্ছে। কোথাও অতিবৃষ্টিতে বন্যায় ভেসে যাচ্ছে আবার কোথাও খরায় ত্রাহি ত্রাহি রব উঠছে। পৃথিবীর গড় তাপমাত্রা অত্যধিক হারে প্রতিবছর বাড়তেই আছে। বিজ্ঞানীরা বলছেন, আজকের পৃথিবী যে হারে দূষিত হচ্ছে, বিশ্ব উষ্ণায়ন যে ভাবে বাড়ছে তা রুখতে আমাদের হাতে বড়জোর ১২ বছর সময় আছে। তার মধ্যে ব্যবস্থা না নিলে পরিস্থিতি নাগালের বাইরে চলে যাবে। ৭০টি দেশের ২৫০ জন বিজ্ঞানী সম্প্রতি পরিবেশ সংক্রান্ত একটি রিপোর্ট প্রকাশ করেছেন। 'সিক্সথ গ্লোবাল এনভায়রনমেন্টাল আউটলুক' নামে ওই প্রতিবেদনে দাবি করা হয়েছে, পরিস্থিতির পরিবর্তন না ঘটালে আগামী ২০৫০ সালের মধ্যে দেশে দেশে অকালে মড়ক লাগবে। সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হবে এশিয়া, মধ্য এশিয়া ও আফ্রিকা। রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যাওয়ায় মৃত্যুর অন্যতম কারণ হয়ে উঠবে। নারী-পুরুষ নির্বিশেষে প্রজনন ক্ষমতা কমে যাবে। শিশুরা সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হবে স্নায়ুরোগে। সুমেরু-কুমেরুর বরফ গলে যাচ্ছে। অনেক শহর আগামীতে সমুদ্রের তলায় চলে যাওয়ারও আশঙ্কা বিজ্ঞানীরা করেছেন। সমুদ্রে প্লাস্টিক দূষণে মাছ মারা যাচ্ছে। ওজোনস্তরের মধ্যে ফুটো হয়ে যাওয়ায় সূর্যের Ultra Violet Ray পৃথিবীতে চলে আসছে। মানুষ ক্যানসার জাতীয় দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে মারা যাচ্ছে।

মাটিতে অত্যধিক রাসায়নিক সার, কীটনাশক ব্যবহার করে বিষাক্ত হয়ে যাচ্ছে। প্রচুর ভূ-গর্ভস্থ জল তুলে

চাষের কাজে লাগানো হচ্ছে। পরিণামে ভূ-গর্ভস্থ জলস্তর কমে যাওয়ায় পানীয় জলের সমস্যা দেখা যাচ্ছে। উৎপাদিত ফসলে বিষ প্রয়োগে নানান রোগের সংক্রমণ ঘটছে। ভূ-গর্ভস্থ জলও বিষাক্ত হচ্ছে। অনেক প্রাণী মারা যাচ্ছে। পরিবেশের এরকম দূষণ ও ধ্বংসের কারণগুলিকে সূত্রাকারে উল্লেখ করা যাক—

১। কার্বন নির্গমনের পরিমাণ বৃদ্ধি।

২। বিভিন্ন যানবাহন ও কলকারখানায় কার্বন মনো অক্সাইডের অত্যধিক বাড়বাড়ন্ত।

৩। পেট্রোলিয়াম জাত পণ্যের ব্যবহারে ভূমি, বায়ু, মাটি— প্রভৃতি আজ চরম জায়গায় পৌঁছে গেছে।

৪। পরীক্ষামূলকভাবে পারমানবিক বোমার ব্যবহার।

৫। সমুদ্রতটের প্রাকৃতিক অবস্থার পরিবর্তন করে কৃত্রিম তটভূমি প্রসার।

৬। শিল্প-কারখানায় অনিয়ন্ত্রিত কেমিক্যালের ব্যবহার।

৭। কৃষিক্ষেত্রে অত্যধিক সার-বিষ-সেচ এর প্রয়োগ।

৮। প্লাস্টিক জাতীয় দ্রব্যাদির ব্যবহার।

৯। বন-অরণ্যকে ধ্বংস করে সেখানের জমি দখল। পরিণামে অক্সিজেনের ঘাটতি, বন্যপ্রাণীদের অবলুপ্তি। সম্প্রতি অ্যামাজনের জঙ্গলের আগুন এক বিরাট প্রশ্নের মুখে ফেলে দিয়েছে।

প্রশ্ন হল প্রকৃতির উপর এই অত্যাচার ও ধ্বংস লীলার পরিণামে সকল মানুষকে ভুগতে হচ্ছে। কিন্তু প্রকৃতির সম্পদ অত্যধিকভাবে ব্যবহারের মুনাফা কি ব্যাপক মানুষ ভোগ করে? না, তা কিছু মাল্টি ন্যাশনাল কর্পোরেশনের হাতেই চলে যাচ্ছে। তারাই এই সকল প্রাকৃতিক সম্পদ আরো বেশি মুনাফার নামে বাড়িয়ে চলেছে। এর উপর রাষ্ট্রগুলির নিয়ন্ত্রণ কি থাকছে?

অতএব মুনাফা নয়, মানববিকাশের জন্য প্রয়োজনীয় প্রাকৃতিক সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার ও তার সংরক্ষণই আগামী প্রজন্মের কাছে কল্যাণকর। না হলে বর্তমানের পাপ, আগামী প্রজন্মকে ধ্বংস করবে।

কিন্তু মানববিকাশক নিয়ন্ত্রণী প্রকৃতির ব্যবহার কোন ব্যক্তি ও আর্থসমাজ করতে পারে? বর্তমানে কোনো দেশে কি তার নমুনা দেখা যাচ্ছে? না কোথাও তা দেখা যাচ্ছে না। প্রকৃতির উপর অনিয়ন্ত্রিত মুনাফাখোরী চলতেই আছে। রাষ্ট্র পরিচালকরা সেই সকল ক্ষমতার হাতের পুতুল হয়ে নাচছে। ব্যক্তি তথা আর্থসমাজের নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালন মানবিক নেতৃত্বের হাতে না থাকলে প্রকৃতিকেও বাঁচানো সম্ভব নয়।

'গো-হারা'

১৯/০৮/২০১৯ আনন্দবাজার পত্রিকার 'গো-হারা' সম্পাদকীয় নিবন্ধে শহরাঞ্চলে গরু নামক প্রাণীটির যত্রতত্র বিচরণ ও তজ্জনিত নানাবিধ সমস্যা ও তাহার কারণ অনুসন্ধান করা হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে সরকারি আইন ও নিয়মের তোয়াক্কা না করিয়া কীভাবে অবৈধ খাটালগুলি শহর সংলগ্ন এলাকায় গজিয়াছে ও গজাইতেছে নিবন্ধে তাহারও প্রাসঙ্গিক উত্থাপন করা হইয়াছে। নগর জীবনে প্রাণীটির এইরকম উৎপাত যেমন নাগরিকদের তেমনি প্রাণীটিরও স্বাভাবিক চলাচলে বিঘ্ন ঘটাইতেছে সন্দেহ নাই। বিধান নগর সহ কলকাতার পুর প্রশাসন আর পাঁচটা প্রশাসনিক বিষয়ের ব্যর্থতার মতই এই বিষয়টিতেও সমানভাবে ব্যর্থ হইতেছে। মোদ্দাকথা এই হল নিবন্ধটির মর্মার্থ। এই মর্মার্থ বাচক নিবন্ধটি নগর জীবনের অস্বাচ্ছ্যন্দ হেতু এবং তাহার প্রতিকারার্থে রচিত সন্দেহ নাই। তাহাতে আপত্তির কোনো কারণ ঘটে নাই। আপত্তির কারণ ভিন্ন। আপত্তি শিরোনাম সহ গুটিকয়েক শব্দ চয়ন ও তাহার ব্যাখ্যানে। আর এই প্রসঙ্গে আনন্দবাজার পত্রিকার বিদ্যা-বৈদগ্ধ কৌলিন্য যে ক্রমশ শূন্য কলসে রূপান্তরিত হইতেছে সেই দিকটিতে আলোকপাত করিতেই এই পত্রাঘাত।

নিবন্ধের শিরোনাম গো-হারা। গো-হারা আভিধানিক অর্থে শোচনীয় পরাজয়। পুরসভার প্রাণীটিকে লইয়া যথাবিহিত বন্দোবস্ত করিবার ব্যর্থতাকে শোচনীয় পরাজয় বলিলে তাহা ঠিকই আছে। অতঃপর মহাভারত তত্ত্বের 'তোমারে বধিবে যে গো-কুলে বাড়িছে সে' এর গো-তত্ত্বে না যাইয়া শিরোনাম ছাড়িয়া দেওয়া গেল।পাঠক এইবারে আসুন গবেষণা শব্দটি লইয়া কথা কহি। নিবন্ধকার লিখিয়াছেন গবেষণা-গো+এষণা অর্থে গরুর অনুসন্ধান, গরু খোঁজা। তিনি নাকি ইহা ছোটবেলায় পাঠশালার গ্রন্থে পড়িয়াছেন। তা সেই পাঠশালার গ্রন্থকার নাকি তিনি নিজে গবেষণায় গরু সন্ধান করিতে গিয়াছেন তাহা বাহির করা এই পত্রের আলোচ্য নহে। আলোচ্য হইল হরিচরণ বন্দোপাধ্যায়, জ্ঞানেন্দ্র মোহন দাস, সুবলচন্দ্র মিত্র অথবা সাহিত্য সংসদের বিদগ্ধ জনেরা নিশ্চয় গরু নহেন। তাঁহারা বঙ্গীয় শব্দকোষ, বাঙ্গালা ভাষার অভিধান, সরল বাঙ্গালা ভাষার অভিধান বা সংসদ বাংলা অভিধান প্রভৃতি মূল্যবান গ্রন্থে গবেষণা-গবেষ+অন+আ বা গো + এষণা এর যাহা অর্থ করিয়াছেন তাহা হইল তর্কাদি দ্বারা যথাবোধিত ধর্মের অন্বেষণ বা বিষয় বিশেষের তত্ত্বান্বেষণ বা কোনো বিষয়ের তত্ত্বনিরূপণার্থে অন্বেষণ বা তত্ত্বান্বেষণ । তাঁহাদের আলোচনায় গরু নামক অতি নিরীহ প্রাণীটি আসে নাই। কিন্তু নিবন্ধকার প্রাণী বিশেষের আলোচনায় গবেষণা টানিয়া আনিয়া তাহার কদর্থ করিয়া অসাধ্য সাধন করিয়াছেন! এক্ষণে আমাদের সম্পাদকীয় বোর্ডের মহামহিম মহাশয় তাঁহার স্বকপোলকল্পিত গরু-সন্ধান শব্দার্থ কোথা হইতে অন্বেষণ করিলেন জানিতে ইচ্ছা হয়।

গো, গবেষণা, গবাক্ষ, স্বর্গ প্রভৃতি সংস্কৃত চিরায়ত সাহিত্য আহরিত শব্দাবলী বাংলা ভাষায় গৃহীত হইয়াছে। ইহারা সেই সাহিত্য-দর্শন প্রত্যয়ের গভীরতম ব্যঞ্জনাময় অভিব্যক্তি। যাহা বস্তুবিজ্ঞানে ব্যুৎপন্ন বিদ্বজন উন্মোচন করিয়াছেন ও করিতেছেন। তাহা যে গো অর্থে কোনো বিশেষ প্রাণী লইয়া সেন্টিমেন্টের ফণাতোলা আবর্ত নহে, তা বলাই বাহুল্য। বস্তুবিজ্ঞানে গো-অর্থে আত্মা, চেতনা, সোল, গন্তব্য, আমিত্ব-চেতনা ইত্যাদি, যা মানব জীবনের লক্ষ্য বাচক। গবেষণা অর্থে আত্মার অন্বেষণ তথা রিসার্চ। গবাক্ষ অর্থে আত্মা হইতে কিরণ সম্পাত। স্বর্গ অর্থে স্ব এর গৈ অর্থাৎ স্বীয় গন্তব্য। যাহার সকলই গম ধাতু হইতে উৎপন্ন।

তাই ইহা বলিয়াই ক্ষান্ত হইতে হইতেছে যে, বাংলা ভাষা-সাহিত্য-দর্শন প্রভৃতির চর্চিত বৈদগ্ধের পরিচয়টি ছাড়িয়া কি আনন্দবাজার নিজে গো-হারা হইতেছে না? আর আর্যসমাজকেও গো হারা করিতেছে না?

[৪ সেপ্টেম্বর, ২০১৯ তারিখে আনন্দবাজার পত্রিকার চিঠিপত্র বিভাগে প্রেরিত এবং যথা-পূর্বং তা পত্রস্থ হয় নাই। পত্রটি হুবহু মুদ্রিত হইল।]

নাগরিক পঞ্জির সত্যি কি কোন প্রয়োজন আছে?

নাগরিকত্ব অর্জন

১) সংবিধান অনুসারে নাগরিকত্ব

অনু.৫) সংবিধান গ্রহণের সময় যারা ভারতের অধিবাসী

অনু.6) নির্দিষ্ট কিছু শর্তে নির্দিষ্ট সময়ের পাকিস্তান থেকে আগত ব্যক্তিরা

২) ১৯৫৫ সালের নাগরিকত্ব আইন অনুসারে

ধারা ৩) জন্মসূত্রে নাগরিক

ক) ২৬/০১/১৯৫০ তারিখে বা তারপরে ০১/০৭/১৯৮৭-এর আগে জন্ম

খ) ০১/০৭/১৯৮৭-এর পর কিন্তু ০৭/০৪/২০০৪-এর পূর্বে জন্ম এবং পিতামাতার কোন একজন সেই সময়ে ভারতীয় নাগরিক

গ) ০৭/০৪/২০০৪-এর পর জন্ম, কিন্তু

গ(১) পিতামাতা উভয়েই ভারতীয় নাগরিক,

গ(২) পিতামাতার মধ্যে একজন ভারতীয় নাগরিক, কিন্তু অন্যজন বেআইনি অভিবাসী নয়

ধারা ৪) বংশোদ্ভূত নাগরিক

ক) ভারতের বাইরে জন্ম হলেও নাগরিক, যদি

ক(১) ২৬/০১/১৯৫০ থেকে ১০/১২/১৯৯২-এর মধ্যে জন্ম কিন্তু পিতা ভারতীয় নাগরিক অথবা ক(২) ১০/১২/১৯৯২ তারিখের পর জন্ম হলেও পিতামাতার একজন অন্তত ভারতীয় নাগরিক

ধারা ৫) নথিভুক্তির মাধ্যমে নাগরিক

বেআইনি অভিবাসী যদি না হয়, কেন্দ্রীয় সরকার আবেদনের ভিত্তিতে যে কাউকে নাগরিক ঘোষণা করতে পারে, যদি:

ক) ভারতীয় কুলোদ্ভব কেউ আবেদনের সাত বছর আগে সাধারণভাবে ভারতে বসবাসকারী হয়ে থাকেন

খ) ভারতীয় কুলোদ্ভব কেউ সাধারণভাবে অবিভক্ত ভারতের বাইরের কোনো দেশের বসবাসকারী হয়ে থাকেন

গ) আবেদনের সাত বছর আগে সাধারণভাবে ভারতে বসবাসকারী কেউ কোনো ভারতীয় নাগরিককে বিবাহ করেন,

ঘ)ভারতীয় নাগরিকের নাবালক সন্তান হয়ে থাকে

ঙ) পূর্ণ বয়স এবং সক্ষম ব্যক্তি যার পিতা-মাতা এই উপ-ধারাটির ধারা(ক) অনুসারে বা ৬ ধারার ১ নং উপ-ধারায় ভারতের নাগরিক হিসাবে নিবন্ধিত হন

চ) পূর্ণ বয়স এবং সক্ষম ব্যক্তি, যিনি বা তার পিতামাতার মধ্যে কেউ আগে স্বাধীন ভারতের নাগরিক ছিলেন এবং আবেদন করার পূর্বে সাধারণভাবে বারো মাস ভারতে বসবাসকারী থাকেন, ইত্যাদি

ধারা-৬) আত্তীকরণের মাধ্যমে (Citizenship by naturalization)

বেআইনি অভিবাসী যদি না হয়, তাহলে তৃতীয় তপশীলে বর্ণিত কতকগুলি শর্তাধীনে কেন্দ্রীয় সরকার আবেদনের ভিত্তিতে প্রাপ্তবয়স্ক এবং সক্ষম কোনো ব্যক্তিকে নাগরিকত্ব প্রদান করতে পারে। শর্তগুলিঃ

ক) এমন কোনো দেশের প্রজা বা নাগরিক হওয়া চলবে না যেখানে ভারতের নাগরিকরা সেই দেশের আইন বা রীতিনীতি দ্বারা আত্তীকরণের মাধ্যমে সেই দেশের প্রজা বা নাগরিক হওয়ার হাত থেকে বাধা পান,

খ) যদি অন্য দেশের নাগরিক হন,

গ) আবেদনের পূর্ববর্তী বারো মাস সময়কালে হয় ভারতে বসবাস অথবা ভারতে কোনও সরকারি চাকরিতে

নিযুক্ত থাকতে হবে,

ঘ) উক্ত বারোমাস পূর্ববর্তী ১৪ বছরের মধ্যে অন্তত ১১ বছর হয় ভারতে বসবাসকারী অথবা ভারত সরকারে কর্মরত হতে হবে

ঙ) ভালো চরিত্র হওয়া চাই

চ) সংবিধানের অষ্টম তপশীলে বর্ণিত একটি ভাষায় দখল থাকতে হবে, ইত্যাদি

ধারা ৬(এ) আসাম চুক্তির শর্তগুলি এই ধকারায় অন্তর্ভুক্ত

আসাম চুক্তিঃ ১৫ আগস্ট, ১৯৮৫

বিদেশি বিষয়ক ধারাগুলি

৫.১ বিদেশি সনাক্তকরণ এবং অপনোদনের জন্য ০১/০১/১৯৬৬ ভিত্তিবর্ষ হিসাবে গন্য হবে।

৫.২ ১৯৬৭ সালের নির্বাচনে ব্যবহৃত ভোটার তালিকায় যাদের নাম অন্তর্ভূক্ত হয়েছিল, তাঁরা সহ ০১/০১/১৯৬৬-এর আগে যারা আসামে এসেছিলেন, তাঁদের নিয়মিত করা হবে।

৫.৩ ০১/০১/১৯৬৬-এর পর এবং ২৪/০৩/১৯৭১ তারিখ পর্যন্ত (উভয় তারিখ অন্তর্ভূত) যে বিদেশিরা আসামে এসেছেন, তাঁদের ১৯৪৬ সালের ফরেনার্স অ্যাক্ট এবং ১৯৬৪ সালের ফরেনার্স ট্রাইব্যুনাল আদেশনামার বিধান মোতাবেক সনাক্ত করা হবে।

৫.৪ এইরূপ সনাক্তিকৃত বিদেশিদের নাম চালু ভোটার তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হবে। এই ব্যক্তিদের ১৯৩৯ সালের ফরেনার্স অ্যাক্ট এবং ১৯৩৯ সালের ফরেনার্স রুলের বিধান অনুসারে সংশ্লিষ্ট জেলার রেজিস্ট্রেশন অফিসারের নিকট নিজেদের নথিভুক্ত করতে হবে।

৫.৫ এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য ভারত সরকার প্রশাসনিক ব্যবস্থা যথাযথ শক্তিশালী করার প্রচেষ্টা নেবে।

৫.৬ সনাক্তকরণের তারিখের দশ বছর মেয়াদ শেষ হওয়ার পরে, ভোটার তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে এমন সমস্ত ব্যক্তির নাম পুনর্বহাল (restored) করা হবে।

৫.৭ যে সমস্ত ব্যক্তি আগে বহিষ্কৃত হয়েছিলেন, কিন্তু তদনন্তর অবৈধভাবে আসামে পুনঃপ্রবেশ করেছেন, তাদের বহিস্কার করা হবে।

৫.৮ ২৫ মার্চ, ১৯৭১ বা তারপর আসামে আগত বিদেশিদের সনাক্তকরণ, অপনোদন চলবে এবং এই জাতীয় বিদেশিদের বহিষ্কারের জন্য বাস্তবোচিত পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।

৫.৯ Illegal Migrants (Determination by Tribunals) Act, 1983 বাস্তবায়নের বিষয়ে এএএসইউ/এএজিএসপি কর্তৃক উত্থাপিত কিছু অসুবিধার বিষয়ে সরকার যথাযথ বিবেচনা করবে।

আসাম চুক্তির পর

১৯৮৫ থেকে ২০১২ পর্যন্তঃ বিভিন্ন ট্রাইব্যুনালে সনাক্তকৃত মোট বিদেশি ৬১,৭৭৪ । তাদের মধ্যে-

০১/০১/৬৬ থেকে ২৫/০৩/৭১	২৫/০৩/১৯৭১ পরবর্তী	মোট	বিদেশি ঘোষিত 'ডি' ভোটার	ডি ভোটার সহ সংখ্যা
৩২,৫৩৭(৫৩%)	২২,৬৪৭(৩৭%)	৫৫,১৮৪	৬,৫৯০(১০%)	৬১,৭৭৪

'ডি' ভোটার- ৫ জানুয়ারি, ১৯৯৮ তারিখে ভারতের নির্বাচন কমিশন নির্দেশ দেয় যে, ভোটার তালিকা সংশোধনের সময়ে যারা তাদের নাগরিকত্বের প্রমাণ দাখিল করতে পারেনি তাদের নাম গুলির বিরুদ্ধে সেই নির্বাচনী ক্ষেত্রের ভোটার তালিকায় 'ডি' অক্ষরটি লিখতে হবে। ১৯৯৮ থেকে জুলাই ২০১২ পর্যন্ত ২,৩১,৫৬৭টি ডি-ভোটার কেস বিভিন্ন ট্রাইব্যুনালে পাঠানো হয়েছিল। ৮৮,১৯২টি কেস নিষ্পত্তি হয়েছিল। ৪৪,২২০ জনকে (৫০ শতাংশ) ভারতীয় ঘোষণা করা হয়েছিল। ৬,৫৯০ জন বিদেশি সনাক্ত হয়েছিলেন। ৩৭,৩৮২ (৪২ শতাংশ) জনের

ক্ষেত্রে কোনো রায় দেওয়া সম্ভব হয়নি।

সূত্র- White Paper on Foreigners' Issue, October 20, 2012, Home & Political Department, Government of Assam

উইকিপিডিয়া বলছে, যারা অনুপস্থিত ছিলেন, তাদেরও ডি-ভোটার দাগিয়ে দেওয়া হয়েছিল।

আসাম সরকারের ওয়েবসাইট অনুযায়ী, ৩১ মার্চ ২০১৬ পর্যন্ত বিদেশি সনাক্ত করা হয়েছে মোট ৭৫,৪৮৯ জনকে। এদের মধ্যে ১৯৬৬-৭১ পর্বের ৩৩,১৮৬ জন এবং তৎপরবর্তী পর্যায়ে ৪২,৩০৩ জন। (সূত্র- https://assamaccord.assam.gov.in/port-lets/assam-accord-and-its-clauses)। তাহলে পরবর্তী তিন বছরে সংখ্যা ১৯ লাখে পৌঁছলো কোন্ মন্ত্রে?

The Illegal Migrants (Determination By Tribunals) Act, 1983

IMDT Act প্রণীত হয়েছিল ১৯৮৩ সালে, আসাম চুক্তির পূর্বে। এই আইনেও ২৫ মার্চ ১৯৭১-এর পর আসামে আগত, অবৈধ অভিবাসীদের সনাক্তকরণের কাজ শুরু হয়েছিল। সর্বানন্দ সোনোয়ালের (আসামের বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী) রিট আবেদনের ভিত্তিতে সুপ্রীম কোর্ট ১২/০৭/২০০৫-এ উক্ত আইন অসাংবিধানিক রায় দিয়ে বাতিল করে দেয়।

১৯৮৫ থেকে জুলাই ২০১২ পর্যন্ত আইএমডিটি আইনে বিদেশি সনাক্তকরণঃ

অভিযোগ জমা পড়েছিল	নিষ্পত্তি হয়েছিল	বিদেশি সনাক্ত হয়েছিল	ফেরত পাঠানো হয়েছিল
১,১২,৭৯১	২৪,০২১	১২,৮৪৬	১,৫৪৭

ঐ একই সময়ের মধ্যে ট্রাইব্যুনালে আপিল মামলায় ৭৩,০৬২টি কেসের মধ্যে ৪২,৩৩৮ জন বিদেশি সনাক্ত হয়েছিল এবং ৮৯৫ জন বহিষ্কৃত হয়েছিল। অর্থাৎ, মোট বহিষ্কার সংখ্যা ১৫৪৭+৮৯৫=২৪৪২ জন।

আসাম এবং ভারতে জনসংখ্যা বৃদ্ধির তুলনামূলক পরিসংখ্যান

সেন্সাস বছর	জনসংখ্যা (লক্ষ)		১০ বছরে পরিবর্তন (শতাংশ)		জনঘনত্ব (বঃ কিমি পিছু)	
	আসাম	ভারত	আসাম	ভারত	আসাম	ভারত
১৯৫১	৮০	৩৬১১	১৯.৯	১৩.৩	১০২	১১৭
১৯৬১	১০৮	৪৩৯২	৩৫	২১.৫	১৩৮	১৪২
১৯৭১	১৪৬	৫৪৮১	৩৫	২৪.৮	১৮৬	১৭৭
১৯৮১	-	৬৮৩৩	-	২৪.৭	-	২৩০
১৯৯১	২২৪	৮৪৬৩	২৪.২	২৩.৯	২৮৬	২৬৭
২০০১	২৬৬	১০২৭০	১৯.৯	২১.৫	৩৪০	৩২৫
২০১১	৩১২	১২১০২	১৬.৯	১৭.৬	৩৯৭	৩৮২

(আসাম সেন্সাস হয়নি ১৯৮১)। (প্রভিশনাল ২০১১)

সূত্র- WHITE PAPER ON FOREIGNERS' ISSUE, ibid

আসামে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ১৯৯১ থেকে কমছে। এই অবস্থায় নাগরিকপঞ্জির কি আদৌ কোনও প্রয়োজন আছে?

('অনীক' পত্রিকার সেপ্টেম্বর-অক্টোবর ২০১৯ সংখ্যা থেকে গৃহীত)।

প্রবন্ধ

বাঙালি চেতনা ও নাগরিক পঞ্জির হুমকি

শ্রীচেতনিক

বাঙালি চেতনার মর্মে সমমানবিক রোমান্স। কী এই সমমানবিক রোমান্স? রোমান্স তো চেতনারই বৈশিষ্ট্য। কিন্তু সমমানবিক রোমান্স সেটি বাঙালি চেতনার বৈশিষ্ট্য। তার মর্ম হল সে নিজের তৈরি আদলে নিজেকেই দেখতে চাই। অন্য কোনো আদলে নিজেকে ফিট করতে চাইনা। অর্থাৎ সে কোনো ইমপোজিশন মেনে নেয় না। যদি বাধ্য হয় তবে তার যন্ত্রণায় মুক্তির সন্ধান করে। এই রোমান্সে সে হাসি কান্নায় সুখে দুঃখে একে অপরের সাথি হয়, অতি বড় শত্রুরও বিপদে পাশে দাঁড়াতে তার বাধেনা।

তাহলে এই যে সমমানবিক চেতনা বৈশিষ্ট্যের বাঙালি সে আজকের দিনে কেন তবে নানান ইমপোজিশনে চুপ করে আছে? সে কি চুপ করে আছে, না কি তাকে চুপ করিয়ে রাখা হয়েছে? রক্ষণকামী কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক ক্ষমতার সাঁড়াশি চাপে সে দিশেহারা। কেন্দ্রীয় হিন্দি-হিন্দু-হিন্দুত্ব এর অতিজাতীয়তাবাদ অথবা প্রাদেশিক পপুলিজম এর দাবড়ানিতে সে সত্যই দিশেহারা। একদিকে তার চেতনায় কেন্দ্রীয় ক্ষমতার বিভাজনী হিন্দু-মুসলিম সেন্টিমেন্টের চাপ, অন্যদিকে প্রাদেশিক ক্ষমতার চাপানো জীবন-যাপনের দুর্বিষহতা তাকে ন্যুজ করেছে সন্দেহ নেই। কিন্তু এ তার অসহ যন্ত্রণায় প্রাথমিক নীরবতাও বটে। নীরবতা ভাঙতে শুরুও করেছে। বাঙালি মানসে অত্যাচার ও দাসত্বের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের প্রবণতা লক্ষ্য করেই তো লর্ড কার্জন বাংলা ভাগের ষড়যন্ত্র করেছিল, সে তো জানা ইতিহাস।

স্বাধীনতার অমোঘ স্বপ্নকে বুকে লালন করে বীর বাঙালি নেতাজির রূপে গর্জে উঠেছিল পরবর্তীতে, ব্রিটিশ কি টের পায়নি? পেয়েছিল। তাই তার নোটবুকে পূর্ব এশিয়ায় তার সাম্রাজ্যের সবচেয়ে বিপজ্জনক ব্যক্তিত্বের তকমা জুটেছিল তাঁর। সে উঠে পড়ে লেগেছিল নেতাজিকে ঢেকে দিতে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কিম্ভূত জট সাজাতে। যাতে দানবিকতার একপিঠে হিটলারকে উসকে দিয়ে উল্টোদিকে মিত্রশক্তির ছদ্মবেশে পৃথিবীর ত্রাতা তাকে সাজতে হয়েছিল। মাঝখানে সোভিয়েত যোগের সমকালীন বাস্তবতাকে চুরমার করে সোভিয়েতকে আত্মরক্ষায় ঐ তথাকথিত মিত্রজোটে যোগ দিতে বাধ্য হতে হয়। নেতাজি পড়ে যান শত্রুর শত্রু আমার বন্ধু নীতির বাধ্যতায়। যোগ দেন অক্ষজোটে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে অক্ষজোটের পরাজয়ে ভারতবর্ষের মুক্তি সূর্য অবনমিত ও আবৃত হয়ে হারিয়ে যায়। মীমাংসাহীন যুদ্ধে ব্রিটিশ লুকিয়ে যায় হিটলারি ফ্যাসিবাদের উল্টোপিঠে। নেতাজিকে হারিয়ে দিতেই কি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের এই কিম্ভূত জটাজাল? হাঁ, এতটাই সেই বাঙালি তেজের বস্তুযোগ্যতা।

স্বাধীনোত্তর পর্বে পশ্চিম পাকিস্তানী অপশক্তি পূর্ব পাকিস্তানের ভাষা সংস্কৃতির উপর আঘাত হানতে উর্দু চাপালে গর্জে উঠেছিল পূর্ব পাকিস্তানি বাঙালি চেতনা। সম্মুখ যুদ্ধে আদায় করে নিয়েছিল স্বাধীন দেশ।

স্মরণীয় যে ঊনবিংশ শতকের বাংলায় শরৎ- ঈশ্বরচন্দ্র- রামমোহন প্রমুখেরা দেশের আর্থসামাজিক অচলায়তনে আঘাত হেনে বাঙালি চেতনাকে নব সংস্করণে ভূষিত করেছিল। ভারতীয় দর্শনতত্ত্বের আর্থসামাজিক প্রয়োগহীনতায় রক্ষণকাম তাকে খণ্ডিত, বিকৃত ও কিম্ভূতকিমাকার যে রূপে দাঁড় করিয়েছিল, তার বিরুদ্ধে অনলস সংগ্রাম চালিয়ে ঈশ্বরচন্দ্র, রামমোহনী চেতনা আর্থসমাজ সংস্করণের উদবর্তন ঘোষণা করেন। রবীন্দ্রনাথ সেই চেতনারই ফসল।

এই র‍্যাশনাল ধারায় বাঙালি সংগঠিত হতে শুরু করল।

ব্রিটিশ ব্রাহ্মণ্যবাদী বর্ণতন্ত্রের সাথে গাঁটছড়া বাঁধল।

বিশ্ব ধর্ম-সভার(?) সংক্রমণে চক্রান্ত করল বাঙালিকে সেই র‍্যাশনাল ধারায় শক্তি সঞ্জীবিত হতে না দিতে।

কিন্তু এই র‍্যাশনাল ধারাকে বাগে আনা যায়নি। রবীন্দ্র চেতনায় বাঙালি পেল সেই র‍্যাশনাল ধারার জাগরণ। যিনি একাধারে ভারতীয় জীবনধারার মৌল জীবন ভাবনার ভাবায়নী শিল্প রূপকার। যে রূপকল্পে একের পর এক সৃষ্টি ধারায় সরস্বতীর আসন অলংকৃত করেছেন বটে কিন্তু একই সঙ্গে তাঁর জমিদারি সত্তার অর্থাৎ বিষয়-বাসনার দ্বন্দ্বেও পথ ভুল করেছেন। তাতে তৃপ্তিও পাননি। আত্মহত্যা করতে গেছেন। সেখান থেকে বেরিয়েও এসেছেন। কোন শক্তিতে? 'অস্তিত্ব'এর ব্যাখ্যানে যা সেই এক ও একমাত্র চিত্তরঞ্জক সমমানবিক রোমান্স এর শক্তিতে। ভাষা ও সংস্কৃতিই যেকোনো জনপদের সঞ্জীবনী আধান– 'অস্তিত্ব'এর এই চিরায়ত সূত্রেই বাঙালি তার ভাষা ও সংস্কৃতি নিয়ে অতীব সংবেদনশীল। এই সংবেদনশীলতার অভিব্যক্তি লক্ষ্য করি রবীন্দ্র চেতনায় কল্লোলিত ফল্গু ধারার সাহিত্য প্লাবনে। রবীন্দ্রনাথের মুক্তিচেতনার বাণীশিল্প আর্থসমাজকে সঞ্জীবিত করেছে যুগে যুগে। কিন্তু রক্ষণকামী ব্রিটিশ শক্তিকে সরাসরি তিনি ঘাঁটাতে যাননি। এইখানে সেই বিপ্লবী বাঙালি কাজী নজরুল তাঁর শিল্পিত অভিব্যক্তিতে আর্থসমাজের ব্রিটিশ শৃঙ্খল মুক্তির অভিপ্রায়কে ভাষা দেন। কোন আপোষ ছাড়ায় তিনি ঘোষণা করেন স্বরাজ টরাজ বুঝিনা– ব্রিটিশকে এখান থেকে উৎখাত করতে হবে। কবির টগবগে আবেগে আর্থসমাজের রেসপন্সহীনতা তাকে ব্যালান্সলেস করে দেয়। কোন শক্তি কীভাবে সেই বিদ্রোহীর মস্তিষ্ককে আক্রান্ত করেছিল?– উল্লেখ্য যে রক্ষণকামী শক্তি তথা দানবিক শক্তি বাঙালি মনীষার সমকালে ও পরবর্তী যুগে মানবিক উজ্জীবনকে বাধা দিতে তাঁদেরকে দেবতার আসনে বসিয়ে দেয়। আর মানুষের সামনে হাজির করে সেই দেবতাদের স্তব গান। যাতে আর্থসমাজ চেতনায় কোনো শক্তি স্ফুরণ না ঘটে। সোভিয়েত কম্যুনিজমের পতনের পর থেকেই বিশ্বে নয়া উপনিবেশিক যে মুক্তবাজারী বিশ্বায়ন নামিয়ে আনল তার বিরুদ্ধে গর্জে উঠেছে বাঙালিই প্রথম। যুগ পন্থার সমকালীন আদর্শহীনতায় তথা দর্শনহীনতায় সেই প্রতিবাদ রাজনৈতিক কৃৎকলায় রূপ পায়নি। কিন্তু তার চেতনা তা মেনেও নেয়নি। নয়া উপনিবেশের সেই আগ্রাসন আজ বাঙালি ভাষা ও সংস্কৃতির উপর নব নব আক্রমণের থাবা নামিয়ে এনেছে, আনছে। যাতে সে তার অতীতমুখী জীবনাচারের গাড্ডায় এই চেতনাকে বন্দি করতে পারে। মিডিয়া তার অন্যতম হাতিয়ার।

অতিজাতীয়তাবাদী কেন্দ্রীয় ক্ষমতা এই বাঙালিকে তথা মানবতাকে হেয়, লাঞ্ছিত করতে প্রাদেশিক সেন্টিমেন্টকে উসকে বিভাজনের রাজনীতির খই খেতে উঠে পড়ে লেগেছে। যার অন্যতম আসামে NRC প্রক্রিয়া। পূর্বতন কেন্দ্রীয় ক্ষমতা রক্ষণকামী নয়া গণতান্ত্রিক পথে নিজেদের স্বার্থ সিদ্ধিতে সেই প্রাদেশিকতাকে মওকা দিয়েই সই করেছিল Assam Accord 1985। যাতে অসমিয়া প্রাদেশিকতার অন্ধত্ব তৃপ্ত হয়েছিল। কিন্তু তাকে ভিত্তি করে National Registrar of Citizen তারা করেনি। আসামে ক্ষমতায় এসেই চণ্ডজাতীয়তাবাদ সেটি শুরু করেছে ২০১৬ থেকে। যার পরিণামে গত ৩১ আগষ্ট ২০১৯ এ প্রকাশিত হয়েছে Final NRC তালিকা। তাতে মোট ১৯ লক্ষের মধ্যে ১৭ লক্ষ বাঙালি নাগরিকতা হারিয়েছে।

এই বাঙালিকেই হিন্দু-মুসলিমের বিভাজনে বিভাজিত করে রক্ষণকামী ক্ষমতা জাতীয় নাগরিক পঞ্জির সমর্থন আদায় করিয়েছিল। আজ প্রায় ৬০ জন ইতিমধ্যেই ডিটেনশন ক্যাম্পে অথবা ফাইনাল লিস্ট বেরনোর পরে আতংকে আত্মহত্যা করেছে। যার বেশির ভাগই বাঙালি। সেখানে বিক্ষোভ আন্দোলন শুরু হয়েছে।

অতিজাতীয়তাবাদী চণ্ড শক্তির এতটাই অন্ধত্ব আজ আর্থসমাজে সংক্রামিত করেছে যে বিভাজনের রাজনীতির এই পরিণামেও তারা দীর্ঘ যুগ ধরে অনুপ্রবেশের তত্ত্ব আওড়ে গেলেও চূড়ান্ত নাগরিক পঞ্জি প্রকাশিত হবার পর সে তত্ত্ব যে তাদের আদৌ টিকছে না সেটি তারা মানতে রাজি নয়। আসলে তারা হিন্দু-মুসলিম সেন্টিমেন্টের বিভাজনে আর্থসমাজকে বিভাজিত করে ক্ষমতার দখল রাখতে চায়। একই থিয়োরি তারা আওড়ায় পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রেও। এখানে

আর্থসামাজিক সংস্কৃতির চর্চাহীনতায় এলিট আশ্রয়ী সেই অপরাজনীতি বাঙালি চেতনায় বিভাজনকে প্রকট করতে উদ্যত। প্রাদেশিক তখৎ এ আসীন আরেক উগ্রতা লোক দেখানো মুসলমান বন্ধু সাজা সেই বিভাজনকে শক্তি দিয়েছে। কেন্দ্রীয় শাসক দলের নেতা মন্ত্রীদের নাগরিক পঞ্জি করার হুমকি অহরহই শোনা যাচ্ছে। তাতে কী হবে? বাঙালির জন্য কারাগার? সমমানবিক চেতনায় মহামান্বিত বাঙালি কি এই উন্মাদদের জুতোয় পা গলাবে, না কি তাদের কে বাঙলা থেকে বিতাড়িত করবে তা নির্ভর করছে আত্মচেতনার দীপ্রতায় সে নিজেকে সঞ্জীবিত করে কিনা তার উপর। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় সে যুগে যুগেই সঞ্জীবিত করেছে নিজেকে– ভাবায়নী শিল্পের শিল্পীয়ানায়।

মৌচাক প্রযৌক্তিক আর্থসমাজ

‘অস্তিত্ব’: বিশ্লেষণ ও সম্পাদনা – ইমদাদুল হক

মনের তিনটি পর্যায় — কামনা, বাসনা ও এষণা। কামনা বিশেষিত চেতনায় নেগেশনের আধিক্য থাকায় মানুষ উপকরণমুখী হয়ে পড়ে। প্রয়োজনের সীমারেখা জানতে পারে না, সম্পদের কুক্ষিকরণ বেড়ে যায়। গীতার নিষ্কাম কর্ম হল কামনা বর্জন করা। বাসনা — চেতনায় নেগেশন নিয়ন্ত্রণে মানুষ ক্রমেই দেহমনের নিয়ন্ত্রক হয়। মানুষ তখন সচেতন হয়ে প্রয়োজনের সীমায় থাকতে পারে। আর উদবৃত্ত মূল্যটি আর্থসমাজ বিকাশে ব্যবহার করে। এষণা — এই উত্তম পর্যায়ে মানুষের ইচ্ছাটিই অনুসন্ধানী। মনের কামনা থেকে এষণায় ক্রমোত্তরণে সেই সমাজ পেতে পারে মৌচাক ন্যায় উদবৃত্ত মূল্যের সমৃদ্ধ ভাণ্ডার। যে ভাণ্ডার থেকে বিভিন্ন প্রকল্প রূপায়িত হতে পারে এবং সেই সমাজের সকলেই প্রয়োজন মতো ভোগ করতেও পারে। যে বাস্তবানুগ ভোগে মেধা প্রতিভায় চাঁদের হাট বসে, সেই সমাজ ভরে যায় শিল্প সাহিত্য বিজ্ঞান চর্চায়।

দ্রষ্টব্য যে, মৌমাছির শ্রম প্রযুক্তি একক। কিন্তু সেই প্রযুক্তিতে মৌ সঞ্চয় একক নয়, তা দলগত। আর তা দলগত বলেই দলভিত্তিক একই মৌচাকে যে মৌ সঞ্চিত হয়, তা সব মৌমাছিই প্রয়োজনানুগ ভোগ করতে পায়। কিন্তু মানুষের শ্রম কখনই একক নয়, তা অনেক একক। ধরা যাক একজন শিক্ষক ক্লাসে পড়ালেন। পড়াতে ক্লাসঘর বোর্ড চক ইত্যাদি ব্যবহার হয়েছে এবং সেই উপকরণগুলি তৈরিতে অন্য মানুষের শ্রম নিহিত আছে। কেউ যদি পায়ে হেঁটেও কোনো সংবাদ অন্যত্র দিয়ে আসেন, তাতেও অন্য মানুষের শ্রম নিহিত আছে। কারণ তিনি যে পোষাক পরে গিয়েছেন, সেই পোষাক তৈরিতেও অন্যের শ্রম মূর্ত। তাই বিনিময়ের সূত্রে মানুষকে সমাজবদ্ধ হতেই হয়। বস্তু চর্চা করে বস্তুধর্মের বিশেষণে বিশেষিত হয়ে মানুষ ব্যক্তিকতা থেকে উত্তরণ ঘটিয়ে নৈর্ব্যক্তিকতায় দলীয় ঐক্যে আর্থসমাজের সমস্যা সমাধানে ব্রতী হতে পারে।

আর্থসামাজিক শ্রম প্রযোক্তা ব্যক্তি যখনই ব্যক্তিগতভাবে মূল্য সঞ্চয়ের ভূমিকা নিয়ে নেবে, তখন শ্রম আর সঞ্চয় শব্দ দুটি অন্ত্যর্থক থাকে না। অর্থনৈতিক বৈষম্যে রক্ষের সব রকম সংক্রমণে আর্থসমাজ বিষাক্ত হয়ে যায়। ব্যক্তি প্রযুক্ত শ্রমমূল্য ব্যক্তিগত সঞ্চয়ে সঞ্চিত না হয়ে মৌচাকের ন্যায় আর্থসামাজিক সঞ্চয়ে সঞ্চিত হলে সকলেই মৌমাছির ন্যায় প্রয়োজনানুগ ভোগ করতে পারে, ভাগ্য নামক দোহাইয়ে কাউকে ভিখারিও হতে হয় না, ব্যক্তি সঞ্চিত মূল্যের পচনে বাজার মন্দা(!) কাভাতও পড়ে না। আর রক্ষ সংক্রামিত এইসব উপসর্গে মানুষকে আত্মপীড়নেও পড়তে হয় না। আলকোরানের মৌমাছি তত্ত্বমর্ম এই বিষয়েরই অন্যতম।

কী সেই মৌমাছি তত্ত্ব? নাহল অর্থে মৌমাছি। সুরা আন নাহল-এর ৬৮ ও ৬৯ আয়াতে মৌমাছি নিয়ে বর্ণনা যা — ‘... ... নিশ্চয়ই এতে একটি নিদর্শন আছে সেই লোকেদের জন্য, যারা চিন্তা-গবেষণা করে।’ হাঁ মৌমাছির যতটুকু প্রয়োজন কেবল ততটুকুই মধু সে মৌচাকে সংগ্রহ করে তা নয়, তার থেকে অনেক অনেক বেশি তা সংগ্রহ করে। যা থেকে সে ভোগ করে ততটুকুই যতটুকু তার প্রয়োজন।

প্রজন্মের পর প্রজন্ম মৌমাছিরা একটি মৌচাক নিয়েই পড়ে থাকে না। মৌচাকের কার্যকারিতা শেষ হয়ে গেলেই তারা পরবর্তী নিসর্গিক (সৃষ্টির সূচনায় মহাবস্তুর নিয়মে বেঁধে দেওয়া) অভিযোজনায় নতুন মৌচাক পুনর্নির্মাণ করে নেয়। এখন প্রশ্ন হল, মৌচাক তারা পুনঃপুন নির্মাণ করে কেন? হাঁ এই প্রশ্নের উত্তরের মধ্যে নিহিত আছে মৌমাছির মৌচাক অর্থনীতির রহস্য। কী সেই রহস্য? না, মৌমাছিরা দেহ-নিঃসৃত উপাদানে মৌচাক নির্মাণ করে। সেই মৌচাক জীবাণু

সংক্রমণে সংক্রামিত হয়ে গেলে তাতে তাদের সঞ্চিত মধু আর ভোগ নিরাপদ হয় না। সংক্রামিত জীবাণু তা শোষণ করে। সংক্রমণের ঘটনাটা একটু একটু করে বাড়তে থাকে চন্দ্রকলার কৃষ্ণপক্ষে। কারণ অবলোহিত তরঙ্গ-নিসর্গ জীবাণুর অনুঘটক। এইভাবে চন্দ্রকলার কয়েকটি কৃষ্ণপক্ষে গোটা মৌচাকটি এক সময় সংক্রামিত হয়ে গেলে তাতে আর মধু থাকে না, মৌমাছির মৌশ্রমই পণ্ড হয়ে যায়। চন্দ্রকলার শুক্লপক্ষে জীবাণু সংক্রমণ কিছুটা কমে যাওয়ার কারণে এই পক্ষে মৌচাকে কিছু মধু পাওয়া যায়। সাধারণ লোকের ধারণা মৌমাছিরা চন্দ্রকলার শুক্ল পক্ষে অর্থাৎ জোনাকিতে কামায় আর আঁধারিতে খায়। এইভাবে সঞ্চিত মধু জীবাণু দ্বারা পুরোপুরি শোষিত হয়ে গেলে পুরানো মৌচাকে ভ্রমর পুঞ্জের কারুরই নিসর্গিক স্বাচ্ছন্দ্য থাকে না। মৌচাকের কার্যকারিতা শেষ হয়ে যাওয়ায় তা অচল হয়ে যায়। তখনই নতুন মৌচাক পুনর্নির্মাণ করার প্রয়োজন হয়। যখন মক্ষীরানি নিসর্গ নৈমিত্তিক অভিযোজনায় দলবলসহ সেই কার্যকারিতা হারানো মৌচাক পরিত্যাগ করে নতুন মৌচাক পুনর্নির্মাণ করে।

পুঁজির সংক্রমণে আর্থসমাজ শোষিত হলে শ্রমিক শ্রম দিয়ে তার প্রাপ্য আবশ্যিক না পাওয়ায় সেই সমাজ হয়ে যায় অচল। যে অচলায়তনে মানে পুরাতন সমাজে ব্যক্তি তার স্বাচ্ছন্দ্য বোধের জন্য আবশ্যিক মূল্য পায় না, তার ব্যক্তিত্ব বিকাশ ঘটাতেও পারে না। সে মাথা গুণতি মানুষ (রক্তকরবী)। যেখানে মুক্তিবাচক বিপ্লবে সেই সমাজের পুনর্গঠন ছাড়া ব্যক্তি মুক্তি বলেও কিছু হয় না। তাই যদি হত তাহলে আর্থসামাজিক রাজনীতিরও প্রয়োজন হত না, ঐতিহাসিক ইসলামের ঘটনাও ঘটত না। ভ্রমর-বিপ্লবী রানির নেতৃত্বে যেমন মৌচাক পালটে যায়, সেই সমাজ বিপ্লবের নির্বাচনী নেতৃত্বে তেমনি সেই পচা গলা সমাজটাকে পালটাতে হয়। রক্ষ কথিত ধর্মের আনুষ্ঠানিকতায় তা পাল্টায় না। অর্থাৎ ভ্রমর বিশেষণে বিশেষিত করে সেই সমাজটাকে মৌচাকের ন্যায় গঠন করতে হয়, যেখানে থাকে না অর্থনৈতিক বৈষম্য। মহাপ্রকৃতিতে মহাস্রষ্টার যা কিছু সৃষ্টি সবই মানুষের সেবার জন্য। প্রকৃতি থেকে শিক্ষা নিয়ে জীবনে অর্থাৎ আর্থসমাজে প্রয়োগ করে অর্থনৈতিক মুক্তি ঘটাতে হয়। এই মর্মে আলকোরানের ইঙ্গিত — 'তোমাদের জন্য বিন্যস্ত করা হল মহাবিশ্ব মহাপ্রকৃতি। তোমরা মনোযোগ সহকারে তা নিরিখ কর, ভাব, প্রযুক্তি নির্মাণ কর, প্রয়োগ কর। যা তোমাদের সেজদা, মানে বাস্তবানুগ হওয়া। তাতেই তোমাদের পুণ্য, মানে কল্যাণ।' মৌচাক ভাঙা গড়ার বিপ্লবটা কেউ করে দেয় না। মৌমাছিদের ট্রাস্ট কেউ গড়ে দেয় না। তারা নিজেরাই করে নেয়। মৌচাক তত্ত্ব আর্থসমাজে প্রয়োগ করতে পারলে তবেই আলকোরান পড়ার সার্থকতা।

মৌমাছির পরবর্তী নেতৃত্ব নিসর্গিকতায় মৌচাকে রিজার্ভ থাকে, কিন্তু মানুষকে তার আর্থসামাজিক নেতৃত্ব নির্বাচন করতে হয়। তার জন্য প্রয়োজন বাস্তবানুগ নির্বাচন প্রযুক্তি। যে নেতৃত্ব মৌচাক প্রযৌক্তিক আর্থসমাজ গঠন করতে পারে। আলকোরান, মহাভারত ইত্যাদির চিরায়ত তত্ত্ব বুঝতে না পারলে জীবন প্রাসঙ্গিকতায় মানুষ তা সেই সমাজ জীবনে প্রয়োগ করতে পারে না। মন এষণা পর্যায়ে উত্তরণ না ঘটালে মানুষ চিরায়ত মর্মে কাল পাত্র ক্ষেত্রিক সেই তত্ত্বের গবেষণাও করতে পারে না, জ্ঞান বিজ্ঞানের চর্চাও হয় না। অর্থাৎ চিরায়ত জ্ঞান থেকে মানুষ দূরে সরে গেলে সেই জ্ঞানের কাল পাত্র ক্ষেত্রিক প্রযুক্তি নির্মাণ করতেই পারে না। তাতে ধ্রুব লক্ষ্যভেদী কোনো প্রযুক্তি না থাকায় আর্থসমাজ অশান্ত হয়েই যায়। নানারকম বৈষম্যের সংক্রমণে তা সংক্রামিত হয়। চিরায়ত জ্ঞানকে সেন্টিমেন্টের মোড়কে শেল্ফে তুলে দিয়ে দেহগত মৃত্যুর পর শ্রাদ্ধ নামক রক্ষ ইন্ধনী অনুষ্ঠানে আবৃত্তি নয়, তা জীবদ্দশাতেই জীবনে বাস্তবানুগ প্রয়োগ করতে হয় আমিত্ব অধিষ্ঠান বাচক ধ্রুবলক্ষ্যের জন্য। আবৃত্তি অনুষ্ঠান করেন কারা? তাঁরা জীবনযাপন করেন কীভাবে? খতম বকসিয়ে চিরায়ত জ্ঞানের কী উন্মোচন হয়? তা আর্থসমাজ জীবনের কোন কাজে লাগে? তা গবেষণায় বিশ্লেষণ করা বিশেষ জরুরি।

গণতন্ত্রের সংকট

দিশাহীন গণমানসে রক্ষণকামী কর্তৃত্ববাদের সংক্রমণ

আযাদ রহমান

চলতি দশকে দিকে দিকে রক্ষণকামী কর্তৃত্ববাদ মাথা চাড়া দিচ্ছে। গণতন্ত্রের পিঠস্থান(?) আমেরিকা, রাশিয়া, তুরস্ক, ব্রিটেন ও ভারতসহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে এই কর্তৃত্ববাদ ক্ষমতা কব্জা করেছে। প্রতিটি ক্ষেত্রেই রক্ষণকামী মুক্তবাজার অর্থনীতির দণ্ডমুণ্ডের কর্তা কর্পোরেট পুঁজি নেপথ্যের বাজিকর। কর্পোরেট পুঁজি এই কর্তৃত্ববাদী মুখের, তাদের ভাষায় স্ট্রং লিডারের, সোশ্যাল ইমেজ খাড়া করেছে। তা করেছে কর্পোরেট মিডিয়ার সাহায্যে জার্নালিজমকে ধ্বংস করে। নিউজের নামে ফেক নিউজ, তথ্যবিকৃতি, মিথ্যার অন্তহীন প্রচারের মাধ্যমে। মিথ্যার প্রচারের রক্ষণকামী সূত্র হল, মিথ্যাকে বার বার আওড়ালে গণমানসে তা সত্য বলেই প্রতীয়মান হবে। আর দিশাহীন গণমানস এই শক্তনেতার পেছনে কেবলই জয়ধ্বনি করতে থাকবে, সমর্থন দিতে থাকবে। হচ্ছেও তাই।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে রক্ষণকামী কর্তৃত্ববাদ চ্যালেঞ্জের মুখে পড়ে। শক্ত নেতার ধারণায় গণমানসকে বেঁধে রাখা সম্ভব হয় না। উপনিবেশগুলি থেকে জাতীয় মুক্তি আন্দোলনগুলি আর্থসমাজ-মুক্তির আকাঙ্খাকে বলশালী করে তোলে। পৃথিবীর অধিকাংশ দেশেই গণতান্ত্রিক ক্ষমতা কাঠামো গড়ে ওঠে। গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠার মধ্যে দিয়ে দেশে দেশে জনকল্যাণের ধারণাগুলি সাংবিধানিক স্বীকৃতি লাভ করতে থাকে। এইভাবে গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠার পিছনে রক্ষণকামের সোভিয়েত ভীতি কাজ করছিল। জনকল্যাণমুখী রাষ্ট্র গড়ে না তুললে পাছে কম্যুনিজম গ্রাস করে। ১৮৭০--১৯১৪ পর্যন্ত এই ভীতি জার্মানিতে প্রবল কাজ করেছিল। উইলিয়াম কাইজার ও বিসমার্ক এই ভয়ে শ্রমিকদের ভাতা সুবিধা সহ বিভিন্ন জনকল্যাণমুখী পদক্ষেপ নেন। তবুও শেষ রক্ষা হয়নি। এইভাবে নব্বই এর দশকের মধ্যেই রক্ষণকামী অপশক্তি গণতন্ত্রের আড়ালে ঢুকে যেতে সমর্থ হয়। তাহলে একটি বিষয় পরিষ্কার যে কম্যুনিজম থেকে দূরে থাকার অন্তর্নিহিত কারণে জার্মানি ফ্রান্স সহ ইউরোপ এই গণতন্ত্রের দিকে ঝোঁকে। ধীরে ধীরে সোভিয়েতকে দুর্বল করে নব্বই এর গোড়ায় রক্ষণকামী শক্তি সোভিয়েতকে ভেঙে দিতে সমর্থ হয়। এরই মধ্যে চিন বিপ্লব ও পরবর্তীতে কিউবান বিপ্লব পৃথিবীর মানুষের সামনে মুক্তির প্রেরণা সঞ্চারী ভূমিকা নেয়। ভারতবর্ষ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কৌণিক বিন্দুতে ব্রিটিশ রক্ষণকামের খপ্পরে থেকে বেরনোর সংগ্রামী শক্তি নেতাজিকে হারিয়ে ফেলে। ক্ষমতা চলে যায় সেই রক্ষণকামী গাঁটছড়ার গণতান্ত্রিক প্রবক্তা জওহরলাল নেহেরুর হাতে। এদেশে রক্ষণকামী মিশ্রতার মিশ্র অর্থনীতি চালু হয়। দু-তিনটি দশক গণতান্ত্রিক পাবলিক প্রতিষ্ঠানের ভিত গড়ে তোলে। কৃষি শিল্প ও অন্যান্য সেক্টরে দেশ অনেকটাই আত্মনির্ভর হতে থাকে। নেহরু উত্তর সময়ে পুঁজি সংকট পুঁজির হোম মার্কেট গড়ে তুলতে কৃষিতে সবুজ বিপ্লব আমদানি করে। এতসব কাণ্ড করেও গণতন্ত্রের সাধের নৌকা তীরে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হয় না। ব্যাপক দারিদ্র্য, অশিক্ষা, কর্মহীনতা গ্রাস করতে থাকে জনপদকে। এরই মধ্যে আন্তর্জাতিক পুঁজি নয়া উপনিবেশের তত্ত্ব আমদানি করে ফেলেছে। যাতে তার দম বন্ধ না হয়। তাই নব্বই এর দশকে সে বিশ্বায়নের নামে মুক্তবাজারী অর্থনীতির বিশ্বায়ন ঘটাল। দেশীয়-বিদেশীয় পুঁজির দেওয়াল বিশ্বায়নের ঝড়ে উড়ে গেল। গড়ে উঠল Multi National Corporation। যে কর্পোরেটের প্রধান হাতিয়ার হয়ে উঠল এই গণতন্ত্র। মাথাপিছু ভোটিং

মেথড়ে ক্ষমতায় যে দলই আসুক না কেন মূল ক্ষমতা সেই কর্পোরেট শক্তিই দখল করে নিল। গণতান্ত্রিক আবহে পাবলিক System এ জনকল্যাণমুখী ব্যবস্থাপত্রগুলি ক্রমশ কেড়ে নেওয়া শুরু হল।

সোভিয়েত-কম্যুনিজম তো আগেই শেষ করা গেছে। চিনেও ১৯৭৬ এ মাওয়ের মৃত্যুর পরে রক্ষণকামী ক্ষমতাধর কম্যুনিস্ট পার্টির নামাবলী গা থেকে না খুলেও রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ববাদী ক্ষমতাতন্ত্র কায়েম করেছে। ফলে সারা পৃথিবীতে মতাদর্শের সংকট তীব্র হয়ে উঠতে থাকল। মানুষের সামনে আর্থসামাজিক জীবন যন্ত্রণার নিরিখে কোন আয়না না থাকায় গণমানস একদিকে উদার গণতন্ত্রের এই কর্পোরেটি শোষণের বিরুদ্ধে বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠতে থাকল, অন্যদিকে কোনো আদর্শ সামনে পেল না। রক্ষণকাম শক্তি একটি ট্রান্জিশনে এসে পৌঁছাল। সে বুঝে নিল আবার তাকে রং বদল করতে হবে। সেই রং বদলে গণমানসের ক্ষোভ ও মুক্তির অভিপ্রায়ের সামনে নিয়ে চলে এল স্ট্রং লিডারের তত্ত্ব। যাতে সেই ঈশপের গল্পের মতো ব্যাঙেদের জন্য সারস রাজা সরবরাহ করল। আর তা করতে তার যতগুলি হাতিয়ার তার অন্যতম অতিজাতীয়তা। জাতীয়তাবাদের সীমাবদ্ধ ধারণার বিরুদ্ধে রবীন্দ্রনাথ কত বছর আগেই মানুষকে সতর্ক করেছেন। কিন্তু রক্ষণকাম কি রবীন্দ্রনাথকে মান্যতা দেয়? দেয় না। তাই ভারতে, রাশিয়ায়, তুরস্কে, আমেরিকায় ও ব্রিটেনে অতিজাতীয়তাবাদীরা ক্ষমতা কব্জা করে বড় সহজেই।

তাহলে গণতন্ত্রের সংকট মানে কার সংকট? কর্পোরেট পুঁজির সংকট। তা থেকে রেহাই পেতে রক্ষণকামী কর্তৃত্ববাদ। তাই মনমোহিনী অর্থনীতির প্রেসক্রিপশন তার কাছে নীতি পঙ্গুত্ব ঠেকে। তাই নরেন্দ্র দামোদর দাস মোদিকে প্রজেক্ট করতে হয়। কিন্তু এই প্রজেকশনে কি তার সংকট কাটে? কাটে না। তার প্রমাণ আর্ন্তজাতিক বাজারের আপাত স্থিতিশীলতা সত্ত্বেও ভারতে মন্দা। চাকরি নেই, টাকা নেই, চাহিদা নেই, বাজার সংকটে পুঁজির নাভিশ্বাস। বেরনোর মন্ত্র রিজার্ভ ফাণ্ড কর্পোরেটদের হাতে তুলে দাও। বেশ, তাতে কী? তাতে কি চাহিদা তৈরি হয়? হয় না। অতঃপর? তার কোনো উত্তর মুক্তবাজার অর্থনীতির প্রবক্তাদের কাছে নেই। শক্ত শাসকের শক্ত শাসনের মজাটা এবার ষোলো আনাই কি আঠারো আনা টের পাওয়া যাচ্ছে না?

এই উন্মার্গগামিতা থেকে আর্থসামাজিক মুক্তি কে দেবে? বস্তুসূত্র কী বলে? এবারে সেই আলোচনায় আসা যাক।

গণতন্ত্রের নির্বাচনী ব্যবস্থায় যে নেতৃত্ব নির্বাচন করছি, তাতে কি জীবন যন্ত্রণা ঘুঁচছে? ঘুঁচছে না। সেখানে পুঁজির মাতলামিতে ঐ গণতান্ত্রিক আবহেই ঐ মাথাপিছু সিস্টেমেই শক্ত শাসকের দাওয়াই কাজ করছে? করছে না। তাহলে?

সমাজ গঠনের গোড়ার কথা আমিত্ব বিকাশ। তার ভিত্তি অর্থনীতি। অর্থনীতিতে উৎপাদিত মূল্যের আবশ্যিক ও উদবৃত্তের বিন্যাস ব্যবস্থাপনা। ব্যবস্থাপনার ভাবায়নী বাস্তবতার চর্চা আর্থসমাজ সংস্কৃতির। আর সেই বাস্তবতা নির্মাণের কৃৎকলা-প্রকৌশল রাজনীতি। রাজনীতির প্রয়োগেই সেই ব্যবস্থা তত্ত্বাবধানের নেতৃত্ব নির্বাচন। যে নির্বাচনে আর্থসামাজিক জ্বালা-যন্ত্রণা ঘোঁচে।

সেই নির্বাচন প্রযুক্তি কেমন? তা বাস্তবানুগ। কী তার সূত্র? তার সূত্র মাথাপিছু ভোট ব্যবস্থাপনায় নেই। তার সূত্র রণনির্বাচন। গণ নির্বাচন নয়। রণ নির্বাচিত নেতৃত্বই সেই কর্তৃত্ব যে কর্তৃত্বের স্বপ্ন দেখতে গিয়ে গণমানস রক্ষণকামী কর্তৃত্ববাদের খপ্পরে পড়ে যাচ্ছে।

চেতনিকভাবে মানুষ তিন ধরনের। ১। গণ— যা ভাসমান। জ্ঞান-হীন, হিত-অহিত বোধ শূন্য। ২। জন — যা জিজ্ঞাসু , প্রশ্নাত্মক কিন্তু Activist নয়।

৩। রণ— যা সিদ্ধান্তবাচক নীতি নির্ধারণে ব্যাপক মানুষের জীবন যন্ত্রণার উদঘাটক ও তার নিরসনে নীতি প্রযোক্তা।

মানব চেতনার এই গণ থেকে রণ উত্তরণেই আর্থসামাজিক সাংস্কৃতিক উদ্যোগ তাই এত জরুরী। যেখানে সংস্কৃতি কোনো সোনার পাথরবাটি নয়। সংস্কৃতি সেই নেতৃত্ব অর্জনের নান্দনিক কৃৎকলা। এই কৃৎকলার সক্রিয়তায় অভিযোজিত হতে গেলেই মানব চেতনায় ব্যক্তিসত্তা, সমাজসত্তা, ব্যক্তি ও সমাজসত্তার

আন্তঃবিশেষক কী তা স্পষ্ট হয়ে ধরা পড়ে। তখন দেখা যায় স্পষ্ট করে ব্যক্তি সত্তা– যাতে রক্ষণকামিতা ও আমিত্বের দ্বন্দ্ব ঘটিয়ে উত্থিত উন্নততর সত্তা আর্থসমাজ সত্তাকে বিশেষিত করে। এই বিশেষিতকরণ প্রক্রিয়াই সংস্কৃতি। যার লক্ষ্য চেতনার গণ স্বরূপের অবলুপ্তি ঘটিয়ে জন ও ক্রমান্বয়ে রণ উত্তরণ।

উত্তোরিত চেতনায় বোধগম্য 'অস্তিত্ব'-এর নির্বাচন প্রযুক্তি।

যা–

১। ভোটিং পাওয়ার নির্ধারণ।

২। দলীয় ইশতিহার প্রণয়ন।

৩। ব্যক্তির নির্বাচন নয়, নীতির নির্বাচন।

৪। পোলড ভোটের ৫০ শতাংশ উর্ধ্বের কমে নির্বাচনী অবৈধতা ইত্যাদি।

তাহলে এই নির্বাচনী বাস্তবতার নির্মাণে ব্যক্তি ও আর্থসামাজের আশু দায়বদ্ধতা কী কী–

১। ব্যক্তি তথা শ্রমিকের নৈর্ব্যক্তিক চরিত্র গঠনে সাংস্কৃতিক অনুশীলন কেন্দ্র গঠন।

২। শ্রমক্ষেত্রে অংশ গ্রহণে উৎপাদিত মূল্যের আবশ্যিক ও উদবৃত্ত চেতনা গড়ে তোলা।

৩। উত্তর জেনারেশনে মেধার জন্মে বাস্তবানুগ দাম্পত্য সতর্কতার ব্যবস্থাসমূহ।

৪। র‍্যাশনালিটি ও অ্যানিম্যালিটি তথা মানবিকতা ও দানবতার মেরুকরণে আর্থসামাজিক কর্মসূচিতে অংশ গ্রহণ।

এই প্রক্রিয়ায় Feel and work, work and feel এর যুগলবন্দিতে আমিত্বের বিকাশ। বিকাশিত আমিত্বের সহযোগী হওয়া ও আর্থসামাজিক প্রভাবনায় 'গণ' স্বরূপের অবলুপ্তি ঘটিয়ে আর্থসমাজ মুক্তির নায়কের জন্মদান প্রয়াসে সাংস্কৃতিক হওয়াটির কোনো বিকল্প নেই।

এই প্রক্রিয়ায় অংশ নিয়ে নিজের মেধা কর্ষণ শুরু করলেই মানুষের সামনে উদঘাটিত হয়ে যায়–

ক) পলিটিক্যাল পার্টিগুলি রক্ষণকামিতার লেজুড়ে ভোটের হিসেব কষে।

খ) বিভাজনের রাজনীতিতে সেন্টিমেন্টে সেন্টিমেন্টে মানুষকে বিভাজিত করে।

গ) রক্ষণকামিতাকে সইয়ে নেয়।

ঘ) জনমোহিনী ড্রাই ডোল (Dry-Dole) দেয়। অধিকার আর ভিক্ষাকে গুলিয়ে দেয়। অর্থাৎ ডোল রাজনীতি চালু করে।

ঙ) আদর্শ তথা কোনো জীবন দর্শন থাকে না।

আসুন আর্থসামাজিক শান্তি-স্বর্গ গড়তে নিজ ও আর্থসমাজ সত্তার 'গণ' উত্তোরণী 'রণ' চেতনার উদবোধনে সক্রিয় হই।

ব্যক্তি ও আর্থসমাজের আন্তঃসম্পর্ক

কিংশুক সন্ন্যাসী

সমাজটা উচ্ছন্নে গেল, রসাতলে গেল- এই সকল বুলি আমরা অহরহ বলে থাকি। কিন্তু এই সব বলতে গিয়ে নিজেদেরকে সেই সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন করি। নিজের দায়িত্ব-কর্তব্য ভুলে যাই। আমাদের কাছে তখন সমাজটাই মুখ্য হয়ে যায়। কিন্তু আমরা এভাবে কি সমাজ থেকে নিজেদের আলাদা করতে পারি? কখনই পারি না। আবার ঐ ব্যক্তিই কখনো বলে কী দরকার ভাই নিজের খেয়ে বনের মোষ তাড়ানোর। এভাবেও সে নিজেকে সমাজ থেকে আলাদা করে। এটাও কি সম্ভব হয়? কেননা ব্যক্তি সমাজকে বাদ দিয়ে কখনো স্বাচ্ছন্দ্যে জীবন চালাতে পারে? তাহলে এই সমাজে ব্যক্তি ও সমাজের পারস্পরিক সম্পর্ক কেমন? কে, কার উপর নির্ভর করে? না, উভয়েই উভয়ের উপর নির্ভরশীল? ব্যক্তি সমাজকে প্রভাবিত অথবা সংক্রামিত করে, না সমাজ ব্যক্তিকে প্রভাবিত অথবা সংক্রামিত করে?- দেখা যাক এই দুই এর বিশ্লেষণ করে–

ব্যক্তির ভূমিকা ও সম্পর্ক

কোনো বিষয়ের নিরিখে মানুষ যখন নিজেকে ব্যক্ত করে, তখন সে ব্যক্তি। আর তা না করতে পারলে সে মাথা গুনতি ব্যক্তি হতে পারে, কিন্তু তাকে ব্যক্তি সংজ্ঞায় সংজ্ঞায়িত করা যায় না। ব্যক্তি বিষয়ের নিরিখে কী ব্যক্ত করে? ব্যক্তি হয় তার যন্ত্রণানুভূতি অথবা সুখানুভূতি প্রকাশ করে অর্থাৎ সুখ-দুঃখের কথাই আমাদের ভাষার ফুটে ওঠে। ব্যক্তির এই দুই অনুভূতির সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে থাকে তার উৎপাদন কাঠামোর ভিত্তি। অর্থাৎ ব্যক্তি উৎপাদনী শ্রমক্ষেত্রের কোন ক্ষেত্রে, কীভাবে শ্রমমূল্য উপার্জন করে এবং সেই শ্রমমূল্যের কীরকম বিধি বন্দোবস্ত করে, সেটিও তার চরিত্র গঠনে ভূমিকা নির্ধারণ করে থাকে। এই দুটি ক্ষেত্র দেখলেই অনেকটাই পরিষ্কার হওয়া যায়, ব্যক্তির আর্থসামাজিক ভূমিকা।

প্রথম বিষয়টির সাথে দ্বিতীয়টি সম্পর্কিত সে কথা আগেই বলা হয়েছে। ব্যক্তি সবসময়ই ভাল থাকতে চায়, খেতে চায়, পরতে চায়, শিক্ষা চায়, স্বাস্থ্য চায়, ভালোবাসা চায়, ভালো কথা চায়– সবকিছুই সে ভালো চায়। তার এই চাওয়াটির সাথেই দ্বিতীয়টির সম্পর্ক। কিন্তু তার এত সব ভালো চাওয়া তো আপনা আপনি পূরণ হয় না, তারজন্য ব্যক্তির আর্থসামাজিক দায়িত্ব-কর্তব্য চলে আসে। চলে আসে তার শ্রমমূল্যের বিভাজনী ব্যবস্থাপনা ও সেই ব্যবস্থাপনায় তার অংশগ্রহণী সক্রিয়তা ও সাংস্কৃতিক চেতনা কর্ষণের সূক্ষ্মতা ও ধারাবাহিকতার চর্চা।

ব্যক্তি শ্রম দিয়ে শ্রমমূল্য উপার্জন করে তা দিয়ে তার চাহিদার প্রয়োজন মেটায়। এই চাহিদা মেটাতে গিয়ে দেখা যায় কারো প্রয়োজন উপার্জিত মূল্যে মিটছে, আর কারো মিটছে না। অর্থাৎ দুটি বিষয় দেখা যাচ্ছে একটি অংশের প্রয়োজন মিটেও মূল্য বাড়তি থাকছে, অন্য একটি অংশের ব্যক্তিবর্গের দিনরাত পরিশ্রম করেও কোথা দিয়ে যে শ্রমমূল্য কোথাও চলে যাচ্ছে সে তা ধরতেই পারছেনা। তার প্রয়োজনীয় আবশ্যিক মূল্যটুকুও পাচ্ছেনা। সেই সব ব্যক্তি ভালো থাকতে পারছে না তথা জীবন নির্বাহ করতে পারে না। এটা কেমন করে হয়, আর এটা হলে ঐ সকল ব্যক্তির দ্বারা আর্থসমাজ কীভাবে সংক্রামিত হয়– দেখা যাক।

মানুষের এমন কিছু প্রয়োজন আছে, যা সবার জন্য কমন। এই কমন বাদেও কিছু প্রয়োজন থাকে, যা সবার জন্যও প্রযোজ্য নয়। তা মেধানুযায়ী হয়। আমরা এই প্রবন্ধে কমন প্রয়োজন নিয়েই আলোচনা করছি। আগেই দেখলাম কমন প্রয়োজনের অতিরিক্ত এবং কমন প্রয়োজনের ঘাটতি বা কমতি। যাদের কাছে এই অতিরিক্ত থাকল (তার সার্বিক কমন প্রয়োজনের নিরিখেই), সেই অতিরিক্ত মূল্য ক্রমশঃ জমতেই থাকে। অপরদিকে যাদের কমন প্রয়োজনের মূল্যের

ঘাটতি থাকে, সেখানেও তা ক্রমশ চলতে থাকে। কেননা প্রথম পক্ষের (যাদের সংখ্যা সমাজে ১০ শতাংশেরও কম) অতিরিক্ত মূল্যকুক্ষির হুব বাড়তেই থাকে, ফলে অন্যদিকে ঘাটতি থাকা অংশের সংখ্যা বাড়তেই থাকে।

অতিরিক্ত মূল্যকুক্ষির ব্যক্তি পরিণাম

সেই মূল্যকেন্দ্রিক তার মন সর্বদা ঘুরপাক খেতে থাকে। তখন সে ভুলে যায় কেন সে এই মূল্য দখল করে চলে। সেই সাথে ভুলতে থাকে তার চেতনা বা মনের অনুভূতির কথা। সে পুরোটাই চালিত হয় এ্যানিম্যালিটির দ্বারা। তার কেবলই জড়ের প্রতি আকর্ষণ বাড়তে থাকে। তার বাইরের চেহেরার চিকন হতে থাকে। ঘর-বাড়ি, পোশাক-পরিচ্ছদ, গাড়ি-ঘোড়া, খাওয়া-দাওয়া প্রভৃতির ঝকঝকে তকতকে হতে থাকে। সেই ব্যক্তিই তার সেই মূল্যকে রক্ষা করতে কতই না পাঁয়তারা, ষড়যন্ত্র করে। তার রূপগুলি কী ঐরকম চিকন হয়? না, কখনই নয়। মূল্যকুক্ষি বাড়াতে ও তাকে রক্ষা করতে সে সমাজে দাপটকামিতা নামিয়ে আনে। আর্থসমাজে নানান ধরনের অপকৌশলের সংক্রমণ করে। মানুষকে হত্যাও করতে পিছপা হয় না। কখনো নারীদের পাচার করে, তাদের বেশ্যা করে —নানান কুকর্ম সে করে। যা কুৎসিত ও বিকৃত চেতনার পরিণাম। ভুলে যায় নিজ দেহমনের প্রতি দায়িত্ব-কর্তব্য। আর্থসমাজের প্রতি দায়িত্বের তো কথায় ওঠে না। কিন্তু যে লক্ষ্যে তার এই উপলক্ষ্য অর্থাৎ কিনা শ্রমমূল্য উপার্জন, তার লক্ষ্য ভুলে উপলক্ষ্যেই মেতে যায়। ফলে আত্মকেন্দিকতার ব্যারিকেডে নিজেকে জড়িয়ে ফেলে। তার বাইরের কিছুই তার চোখে পড়ে না। পড়লেও সেটা তার সমস্যা নয় বলে মনে করে। সব সমস্যাকে ধন দিয়ে মেটাতে থাকে। দেহমনে উপর নিয়ন্ত্রণ না থাকায় তার এই মূল্যকুক্ষির পাহাড়ে শান্তি খোঁজে। সেখানে কেবলই জড়স্বাদের তাৎক্ষণিকতা জোটে।

কিন্তু তাতেও তার উদ্দর ভরে না, মূল্যকুক্ষির নানান অপকাণ্ডের নতুন নতুন অপকৌশল খাড়া করে। কখন যে নিজেকে হারিয়ে ফেলে তা বুঝতেই পারেনা। আর নিজেকে হারানো, মানেই লক্ষ্য হারানো। আর লক্ষ্য হারানো মানেই স্বর্গ হারানো। আর স্বর্গ হারানো মানেই শান্তি হারানো।

আবশ্যিক মূল্যের অভাবে ব্যক্তি পরিণাম

আগেই আমরা উল্লেখ করেছি একটা বিরাট অংশের মানুষের কাছে শ্রমমূল্যের আবশ্যিক বা কমন অংশই থাকেনা। কী থাকে তাদের কাছে? তাদের কাছে থাকে ঐ যারা মূল্যকুক্ষি করে নিয়েছে, সেই মানস, যাকে বস্তুবিজ্ঞানের ভাষায় বলে মানস পুঁজি। তখন এই ব্যক্তিরা তাদের বুদ্ধির তারতম্যে বিভিন্ন উপায়ে একে অপরের থেকে মূল্য আদায়ের অপকৌশলে নামে। সকলের বুদ্ধি সমান নয় বলে, কেউ কেউ পুঁজি মানসের ভাড়া খাটতে শুরু করে, কেউ দুর্নীতিতে যুক্ত হয়, দু নম্বরি, চার নম্বরি উর্পাজনে নামে। কেউ কেউ এসব না পারলে জুয়া, মদ, মাতলামিতে পড়ে যায়। কিন্তু তারা তাদের শত্রুকে আর শনাক্ত করতে পারেনা। নিজেদের জীবন-জীবিকার মাধ্যমে সংসারের প্রয়োজন না মিটলে, তারা নানান ধরনের বিকৃতির পথে নামে। জীবনের নিয়মকে নিয়ম বলে মনে করতে পারে না। সবকিছুকে খণ্ড খণ্ড করে দেখতে থাকে। ফলে এসবের জন্য ওপরওয়ালাকেও দায়ী করে থাকে। ভাগ্যের কথা নিয়ে আসে। এরজন্য ভাগ্য গণকের কাছেও যায়। তাবিজ-কবজ, মাদুলি-তসবি ধরে। কিন্তু কিছুই পরিবর্তন হয় না। তখন সেটাকেই তারা নিয়ম বলে মানতে থাকে। যে রিক্সাচালক প্রতিদিন মদ খেয়ে এসে নিজের শোষণের যন্ত্রণা ভুলতে গিয়ে নিজেকে পরিবারকেও সংক্রামিত করতে থাকে। যারা কর্পোরেটের ভাড়া খাটে, তাদের কমন প্রয়োজন হয়তো মেটে, কিন্তু সেই কর্পোরেটী কাঠামোতে তাকে এমনভাবেই ঘিরে ফেলে যে, সেই অর্থ নিয়ে পরিবারের সাথে সময় কাটাতেও তাকে দেয় না। সেখানেও জীবনভোগের অবকাশহীনতায় নানান নেশায় আক্রান্ত হয়। তার পরিবারও অশান্তির আগুনে পুড়তে থাকে।

ব্যক্তির শ্রমমূল্যের সাথে আর্থসমাজের ভূমিকা ও সম্পর্ক

উপরের বক্তব্যে ব্যক্তির যে সকল বিষয় তথা— শ্রমক্ষেত্র, শ্রমমূল্য, মূল্যের বিন্যাসের কথা উল্লেখ

করেছি, তা ব্যক্তি কখনোই একা একা করতে পারে না। মূল্য বিনিময়ের সম্পর্কে তাকে আসতেই হয়, অর্থাৎ আর্থসামাজিক সম্পর্কে সম্পর্কিত হতে হয় আমাদের সকলকেই। সমাজ কাঠামোর প্রতিটি ব্যক্তি এক একটা ইউনিট। বুদ্ধিগত তারতম্যে সমাজের কেউ কেউ থাকে হাদা, ভোঁদা, আবার কেউ থাকে শিয়াল পণ্ডিত। আর্থসমাজে শ্রমমূল্য নির্ধারণ ও মূল্য বিন্যাসী উপযুক্ত অর্থনীতির নিয়ম বা নিয়ন্ত্রণ না থাকলে কেউ হয়ে যায় ট্যাংরা-পুঁটি আর কেউ কেউ হয়ে ওঠে রাঘব-বোয়াল। অর্থনীতির নিয়ন্ত্রণহীন আর্থসমাজে রাজনীতির নামে চলে অপরাজনীতি, সংস্কৃতির নামে চলে অপসংস্কৃতি, ধর্মের নামে চলে ঐতিহ্যিক ট্রাডিশন, মানবতার নামে চলে উদারতা, বস্তুবিজ্ঞানের নামে চলে নিরপেক্ষতা, ট্যালেন্টের নামে দক্ষতা, মেধার নামে আতলেমি, দাম্পত্যের নামে লিগ্যাল প্রস্টিটিউশন, নেতৃত্বের নামে সেবাদাসত্ব প্রভৃতি— যা ঐ সমাজে আর্থসামাজিকভাবেই বিকৃতির সংক্রমণ ঘটাতে থাকে। এই বিকৃত আর্থসমাজের আবশ্যিক মূল্য না পাওয়া ব্যক্তিরাও সেই সংক্রমণের দ্বারা সংক্রামিত হয়ে নিজের জীবনের বস্তুর সাথে আপোষ করতে থাকে। নিজের 'আমি'র উপর নানান ধরনের আরোপণ ঘটাতে থাকে। যার পরিণামে ঐ সকল ব্যক্তিরাও রাঘব-বোয়ালদের ভাড়া খাটা দাসে পরিণত হয়ে যায়। সমাজের বিকৃতির নোংরা ঘাঁটতে থাকে। কেন তারা কমন প্রয়োজন মেটাতে পারেনা? কেন তাদের জীবনে এত অশান্তি? এর ব্যাকগ্রাউণ্ডে কারা বা কে রয়েছে? এই সব প্রশ্নেই আসতে পারে না। ঐ রাক্ষসরা শেখায় যে তোমরা চেষ্টা করে যাও, দেখবে একদিন আমার মত তুমিও হয়ে গেছো। কারো প্রতি হিংসা করো, কর্ম করো— নানান মিষ্টি মিষ্টি কথার অমৃতবিষ স্প্রে করতে থাকে। গণমানস সেই কর্পোরেটী নাগরদোলায় চেপে আর্বতিতই হতে থাকে, কলুর বলদের মতো কলুর ঘানি টানতে থাকে। জীবনে তামসিকতা আরো তমসায় নিমজ্জিত হয়।

বস্তুবিজ্ঞানের নিয়মে ব্যক্তি ও আর্থসমাজের ভূমিকা ও সম্পর্ক

ব্যক্তিও রাক্ষস রাবণের দোসর আবার সমাজও তার মিত্র। কারণ আগেই বলেছি যে ব্যক্তির সমষ্টিই সমাজ। সমাজে ব্যক্তির বিনিময়ের সম্পর্কই আর্থসমাজ। কিন্তু ব্যক্তি তথা আর্থসমাজের শ্রমক্ষেত্র, শ্রমমূল্য, মূল্য বিন্যাসনের নীতিই যদি অপনীতি বা দুর্নীতিযুক্ত হয়, তবে তো সমাজ কাঠামোও বসবাসের অযোগ্য হয়ে পড়ে। এখানেই বস্তুবিজ্ঞান নির্দেশিত মৌমাছির 'মৌচাক তত্ত্বে'র প্রতি দৃষ্টি দিতে হয়। মৌমাছি চাঁদের শুক্লপক্ষে ফুল থেকে মধু সংগ্রহ করে। আর চাঁদের কৃষ্ণ পক্ষে তা ভক্ষণ করে। কিন্তু সেই চাকে পোকা লেগে বা বাস করার অযোগ্য হয়ে গেলে, তারা পুরো মৌচাকটাই ত্যাগ করে অন্যত্র আবার নতুন করে মৌচাক গঠন করে। মহাভাষ্যের সেই নিদর্শন কে আমরা মানব সমাজ অনুসরণ করি না। করি না বলেই তো পচা-গলা সমাজের বিকৃতিতে ব্যক্তি ও সমাজ জীবনকেও বিকারগ্রস্ত করে ফেলি। বস্তুর নিয়মে আমাদের সেই সমাজ কাঠামোকে পরিবর্তন করার-ই বিধান দেয়। তাহলে আমরা কী দেখলাম, ব্যক্তির মধ্যে থাকা রক্ষণকামী মানসিকতায় সমাজ ক্ষমতাকে কব্জা করে, সেই ব্যক্তিই তখন সমাজের এক একটা রক্ষ-রাক্ষস বনে যায়। অর্থাৎ কিনা সমাজ রাক্ষস-রাবণ প্রতিটি ব্যক্তির মধ্যেই বিদ্যমান। আর্থসমাজের ক্ষমতাকে কব্জাকৃত করতে পারঙ্গম হোক কিংবা না হোক। এখানেই আমাদের ব্যক্তির সত্তার পরিচিতি প্রয়োজন।

ব্যক্তি সত্তায় দুটি শক্তি রয়েছে। জ্ঞান-দর্শনে একটি দিকে বলেছে— অসুর - শয়তান - ইবলিস - দানব - নেগেশন আর অপরদিকে বলেছে— সুর - ইনসান - মানব - অনুভূতি - চেতনা - আমিত্ব - এ্যাফারমেশন। মানুষ জন্মগত ভাবেই দানবিক শক্তির কবলে থাকে। দানবিক শক্তির বিশেষণ হল অনধিকার দখলদারিত্ব। সে তার প্রয়োজনের অতিরিক্তে সর্বদায় হাত বাড়ায়। প্রয়োজনের সীমা নির্ধারণ করে না। ফলে সে লক্ষ্মী স্বরূপে উৎপাদন করে। আবার সে-ই গণেশীরূপে ইঁদুরের বিশেষণে বিশেষিত হয়ে উৎপাদিত শ্রমমূল্যের অতিরিক্তকে চুরি করে ধন রূপে কুক্ষিগত করে। তাহলে মানুষের মধ্যেই উৎপাদনকারী লক্ষ্মী বিশেষণ, আবার তারই মধ্যে ধন কুক্ষিকরা গণেশী বিশেষণ।

এভাবে তার সেই কুক্ষির পাহাড় জড়ো করতে গিয়ে অর্থাৎ রক্ষা করতে ঈর্ষারূপ কালীয় নাগের পাহারাও বসায়, তখনই সে রক্ষণকামী রাক্ষুসে বিশেষণে বিশেষিত হয়। তারই মধ্যে থাকা মানবিক শক্তি তথা শিব শক্তি বা শুভ শক্তির উজ্জীবনী চর্চাতে দানবিক শক্তিকে হরণ করতে হয়। যতক্ষণ সে দানবিক শক্তির তলায় থাকে ততক্ষণ তারই শিব বা শুভ শক্তির উপর কালী বা তামসিক শক্তির দাপাদাপি চলতে থাকে। সেই শিব বা শুভ শক্তিতে জল সিঞ্চন করে জাগিয়ে তুলতে হয়। তাকে জাগাতে গেলে মানব দেহের মধ্যে থাকা অসুর— দেহের জীবানুরূপ অঘাসুর-মঘাসুর, ঈর্ষারূপ কালীন নাগ এবং সব শেষে আর্থসমাজরূপ মহিষাসূর প্রভৃতিকে বধ অর্থাৎ নিয়ন্ত্রণ করতে হয়। তার জন্য প্রয়োজন ত্রিশূল বা জ্ঞান-বিশ্বাস-সংগ্রাম। অর্থাৎ ব্যক্তিকে সত্তা নিহিত নেগেশনের কবল থেকে আমিকে বের করে আনতে হবে। সত্তার অচেতন থেকে চেতন-দৃষ্টি-প্রেম-দ্বন্দ-দহন-মুক্তি এবং অধিষ্ঠান— এই লক্ষ্যে নিজেই মধ্যে থাকা দানবিকতার সাথে সংগ্রামে সামিল হতে হয়।

ব্যক্তিকে তার অনুভূতি শক্তি তথা চেতনা শক্তির দ্বারা অনধিকার দখলকাম রক্ষণকামিতায় লাগাম পরাতে হয়। না হলে তার উৎপাদনী শ্রমমূল্যের হিসেব সে ব্যক্তিগতভাবেই করতে পারেনা। সেই হিসাবে এলেই দেখা যায় তার প্রয়োজন আর অপ্রয়োজন। অর্থাৎ শ্রমমূল্যের দুটি অংশ— একটি আবশ্যিক, অপরটি উদ্বৃত্ত। আবশ্যিক অংশটি তার। উদ্বৃত্তটি আর্থসমাজের। তাকে দ্বিতীয় অংশটি ত্যাগ করতে হবে। তারই আবশ্যিক মূল্যের যথার্থ ভোগ লক্ষ্যে। তবেই সে মূল্য ভোগ করতে পারবে।

এই ত্যাগ ভোগ ব্যক্তি করতে পারে নিজেকে নৈর্ব্যক্তিক চর্চার মধ্য দিয়ে। আর মৌচাক প্রযৌক্তিক আর্থসমাজ গঠনের লক্ষ্যে প্রথম ধাপই শ্রমিক তথা ব্যক্তির নৈর্ব্যক্তিক ব্যক্তিত্ব অর্জনের চর্চা।

ছেলে মানুষ করা

সঞ্জীবন

একটি শিশু জন্মগ্রহণ করে প্রাকৃতিক অবস্থায়। শিশুটি ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর মা-বাবা ও পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের প্রীতিময় সাহচর্যে ও প্রকৃতির মিথস্ক্রিয়ায় বড়ো হতে থাকে। শিশু অবস্থায় বাবা-মা ও অন্যান্য সদস্যরা সকলেই খুবই যত্ন নেন। এই পর্যায়ে লক্ষ্য করলে দেখতে পাই- একটি শিশু অসুস্থ বা অস্বস্তি বোধ করলে কান্না করে। তার কান্নার কারণে শিশুটির বাবা-মা ও অন্যান্য সদস্যরাও চিন্তিত হয়ে পড়ে, কান্না থামানোর চেষ্টা করে। আর শিশুটি স্বস্তি বা সুস্থ বোধ করলে সবার সাথে খেলা করে, খিলখিলায়ে হাসতে থাকে। এই দেখে পরিবারের সকলেই আনন্দ পায়, শান্তিবোধ করে। শিশু অবস্থায় বাবা-মা ও অন্যান্য সদস্যরা যেমন যত্ন করে তেমনি শিশুটি তাদের প্রতি বাধ্য থাকে। বিভিন্ন আবদার ও নিরাপত্তার জন্য শিশুটি যত্ন নেওয়া ব্যক্তিদেরই আশ্রয় নেয়। লক্ষ্যণীয় যে, মা বাবা (অন্যান্য সদস্য) তার সন্তানের সুস্থ থাকার বা ভালো থাকার জন্য ভাবতে থাকে, চিন্তা করে অর্থাৎ চেতনার কর্ষণ করে। বাবা-মাও সন্তানের সুনজরে থাকে। কিন্তু শিশু সন্তান যত বড়ো হয় সন্তানের প্রতি বাবা-মায়ের যত্নের ক্ষেত্রে শৈথিল্যও তত বাড়তে থাকে। অর্থাৎ চেতনার কর্ষণ কম করতে থাকে। যার ফলে তার নিজের ও সন্তানের সমস্যা সমাধানের জন্য প্রযুক্তি নির্মাণ করতে পারে না। আর বাড়তে থাকে, দখলকামিতা, সুনামকামিতা আর ট্রাডিশনে আবর্তিত হওয়ার মানসিকতা। চেতনা ডুবে যায় জড় ভোগে। যা চেতনাকে বিবিধ নেগেশনে আচ্ছন্ন করে দেয়। আর আচ্ছন্ন পরিবারও আর্থসমাজের জন্য শান্তির দিশা কখনোই দেখতে পারে না। বরং নিজের দাপট বজায় রাখার জন্য পরিবার ও আর্থসমাজ খণ্ডে খণ্ডে ভাগ করে।

চেতনার কর্ষণ একটি নিরবচ্ছিন্ন ধারাবাহিক প্রক্রিয়া। এই কর্ষণে শৈথিল্য করলেই চেতনা অধগামী হয়। এই প্রসঙ্গে উদাহরণ নেওয়া যাক–

১। রতন পেশায় একজন শিক্ষক। মাস্টাররা ছিলেন ১০ ভাইবোন। ছোটবেলায় বাবার অযত্ন আর অর্থের সংকটের কারণে তারা সকলে দুবেলা ঠিকঠাক খেতে পেতেন না। চাকরি পাওয়ার আগে তিনি গ্রামের একজনের বাড়িতে চাকরের কাজ করতেন। তার সুবাদে সেই বাড়িতে তার ভাইবোনদের একবেলা খাবারের ব্যবস্থা হত। এমনকি একসময় বাংলাদেশে চৌর্যবৃত্তির কাজও করতেন, পাশাপাশি টিউশন পড়াতেন এবং নিজের পড়াশোনা করতেন। এইভাবেই নিজের পড়াশোনা, খাবার ও পরিবারের ব্যবস্থা করতেন। যার জন্য তাকে প্রতি নিয়ত চেতনার কর্ষণ করতে হয়। তার অভাব পুরণের প্রযুক্তি নির্মাণ করতে হয়। একসময় তিনি শিক্ষকতার চাকরি পান। তাতেই তার চেতনা জড়ভোগে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। আচ্ছন্ন থাকার কারণে বাবা-মা, পরিবার থেকে পৃথক হয়ে যায়, টাকা টাকা করতে থাকে আর বলতে থাকে কাল তো মরেই যাব, আজ খেয়ে নিই (ডাক্তারের নিষেধ সত্ত্বেও)। জড়ভোগে আচ্ছন্ন থাকার কারণে টাকা থাকা সত্ত্বেও তার তিন ছেলেমেয়ের একাডেমিক শিক্ষাক্রমের ব্যবস্থা করতে পারেননি। যার জন্য ছেলে হয়ে যায় জুয়াড়ি ও কর্ম অক্ষম। চেতনার কর্ষণহীনতার কারণে তাকেও অশান্তি পোহাতে হয়।

২। নাম নিশীথ। পেশায় ডাক্তার ও শিক্ষক। শিক্ষকতা করে বিকেলে ডাক্তারি করেন। যৌবনকালে তার শরীরে জটিল রোগ বাসা বাঁধে। আর্থিক সংকটের কারণে সঠিকভাবে চিকিৎসা করাতে না পারায় শরীরের বিভিন্ন অঙ্গের বিকৃতি ঘটে। তার স্ত্রী বেশ বুদ্ধিমতী ও শিক্ষিত। তাদের দুই ছেলে। তাছাড়া তাদের পরিবারে আছে মৃত ভাইয়ের চার ছেলে মেয়ে। ভাই এর ছেলে মেয়েদের তিনি লেখাপড়া শেখান ও ভালোভাবে মানুষ করে তোলেন। পরবর্তীতে সরকারি চাকরিও পায়। তাছাড়া ডাক্তারের দেখানো সঠিক পথে চলে সমাজের অনেক মানুষ উপকৃত হয়। সমাজের

খারাপ মানুষদের চিহ্নিত তাদের পাতানো ফাঁদে যাতে মানুষ না পড়ে তার পরামর্শ দেন।

ডাক্তারের বড়ো ছেলে একাডেমিক শিক্ষায় ভালো, ব্যবহারিক গুণও ভালো এবং সহযোগী প্রকৃতির। কোনো প্রকার খারাপ কাজ তার পছন্দ নয়। ডাক্তার তার যাবতীয় খোঁজ খবর রাখেন। যেমন, ছেলে কোথায়, বেড়াতে যাচ্ছে, কাদের সাথে মেলামেশা করছে, কোন শিক্ষকের কাছে পড়ছে কেমন পড়াশোনা করছে প্রভৃতি। বড়ো ছেলেও বাবা মার বাধ্য এবং তাদেরকে সম্মান ও শ্রদ্ধা করে। বিভিন্ন বিষয়ে ও বিভিন্ন কাজে এবং তার মতামতকে প্রাধান্য দেন।

অন্যদিকে ছোটো ছেলে একাডেমিক শিক্ষায় ভালো হলেও উচ্ছৃঙ্খল প্রকৃতির। তার পরিবার ও নিকটস্থ আত্মীয় স্বজন শিক্ষিত বলে হীনমন্যতার কারণে পরিবারের সদস্য ও আত্মীয় স্বজনদের সাথে মেলামেশা করতে পারে না। এমন কি বাড়িতে আসা আত্মীয় স্বজনদের সামনেই বিভিন্ন ভাবে হেনস্থা করতে থাকে বাবা-মা। যেমন- আমার এই যে ছোটো ছেলে পড়াশোনা করে না, সারাদিন শুধু ঘুরে বেড়ায় । এর ফলে ছেলের মধ্যে সেন্টিমেন্ট তৈরি হয়। বাবা মা ও আত্মীয় স্বজনদের থেকে লুকাতে থাকে। সে প্রতারণামূলক ও চুরির মানসিকতায় নেমে যায়। সমাজের উচ্ছৃঙ্খল ছেলেদের সাথে মেলামেশা করতে থাকে। কারণ প্রত্যেক মানুষের সহজাত বৈশিষ্ট্য হল নিজের মতের প্রাধান্য পাওয়া বা মত প্রকাশের অবকাশ খোঁজা। ছেলে বাউণ্ডুলে হয়ে গেছে বলে বাবা-মা ছেলের যত্নের প্রতি অনীহা দেখায়। অর্থাৎ বাবার মধ্যেও রক্ষণকামিতা কাজ করে। আর এই রক্ষণকামিতা ছেলেকে সঠিক পথে নিয়ে আসার পথ নির্মানের যে কর্ষণ তা থেকে বিরত রাখে। ছেলে সারাদিন কী করছে, কী খাচ্ছে, কোথায় যাচ্ছে, কার সাথে মেলামেশা করছে, কোনো খবর রাখেনা যার ফলে ছোটো ছেলে বাবা-মার অবাধ্য, তাদের সম্মান ও শ্রদ্ধা করে না। মস্তান ও জুয়াড়ি প্রকৃতির হয়।

এই উদাহরণে একটু চোখ বোলালেই কি প্রাঞ্জল হয়ে ধরা পড়ে না যে মানব চেতনা কর্ষণ আর অকর্ষণের পরিণাম কী? হ্যাঁ, অবশ্যই পড়ে। তাতে দেখি চেতনা কর্ষণেই আনন্দ আর শান্তিময় জীবনভোগ, আর চেতনার কর্ষণহীনতাতেই জড় মোচ্ছব্বের ছড়াছড়ি। আর অশান্তি ও দুর্ভোগ। এই অশান্তি দুর্ভোগ থেকে বাঁচতে ছেলে মানুষ করা কী, তার উত্তর সেই চেতনা কর্ষক মানুষের কাছে অবশ্যই ধরা পড়ে। যেখানে বর্তমান সমস্যা তার বার্তমানিক স্বরূপে তার কাছে ঠিকই প্রতিভাত হয়। আর তার সমাধানে বাস্তবসম্মত পন্থারও প্রয়োগ সে ঠিক মতই নিতে পারে।

মানুষের এই চেতনা মন্থন সূত্রেই তার সত্তার পরিচিতি তার কাছে পরিষ্কার হয়ে ধরা পড়ে। চিহ্নিত হয় নিয়ম ও অনিয়ম। নিয়মের অধীনে নিজেকে বিন্যস্ত করার সংগ্রামে তাকে সংগ্রামী হতে হয়। এই সংগ্রামী ব্যক্তিত্বেই ছেলে মানুষ করার যত্নও বস্তুতে কার্যকর হয়। আর যারা সত্তার না বাচকতার অনিয়মে বন্দি তারা সেই না বাচকতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেনা। সংগ্রামী হয়না। ঝোলাগুড়ে মাছির মতোই তারা ডুবে যায়। এই মানুষের কাছে ছেলের জন্ম পূর্ব প্রস্তুতি তো দূরের কথা জন্মের পর ছেলে মানুষ করার কুস্তিতে সেই ছেলের যে কী হয় তা আশেপাশে একটু তাকালেই দেখতে পাওয়া যায়। এরা কোনো সূত্রে আর্থসমাজে একটু আধটু বিষয় পেয়ে গেলেই তাতে নিজে ও তার পরিবেশকে সেই জড়ের মোচ্ছবে মাতিয়ে দেয়। যার পরিণামে আমিত্ব অন্ধ এই সব ব্যক্তিবর্গ আরো আরো আমিত্ব-অন্ধেরই আর্থসমাজে সংক্রমণ করতে ছাড়েনা। বস্তুবিজ্ঞানের প্রশ্ন, অন্ধ তো অন্ধত্বই ছড়ায়, চোখেল কি চোখ দান করতে পারে না? এই প্রশ্নের জবাব, অবশ্যই পারে। তারজন্য চোখেল হয়ে খুঁটিয়ে দেখতে হয় জীবনের বিভিন্ন পরত। সমাজের বিভিন্ন পরত। জীবন ও সমাজের কাঠামোগত সম্পূর্ণ ধাঁচাটি। যাতে সেই চোখ আরো উজ্জ্বল দৃষ্টিতে জীবন যন্ত্রণার কারণগুলিকে খুব সহজে প্রাঞ্জল ভাষায় ব্যক্ত করে নিজের কাছে, আর আর্থসমাজের কাছে। চিহ্নিত হয় মানুষের শত্রু। শত্রুর বিরুদ্ধে খাড়া হয় জ্ঞান-বিশ্বাস-সংগ্রামের খড়্গ। এই ত্রিশূলের রাজনীতিগত প্রয়োগেই মানব জীবনবাঞ্ছা পূর্ণতা পায়। আর সামগ্রিক দৃষ্টিকোণ থেকে জীবনকে দেখতে জানলে তাতে ছেলে মানুষ করাও সার্থক হয়।

ধর্ম-রাজনীতি ও ধর্মনিরপেক্ষতা

উজান

আজকের দিনে ধর্ম এক মেরুর জিনিস, রাজনীতি অপর মেরুর। এখানে ধর্ম বলতে ঐতিহ্য ও প্রথাপালনী আচরণকেই বোঝানো হচ্ছে। ধার্মিক লোক হয়ে রাজনীতিতে অংশগ্রহণ যেন সারমেয়র মাংস ভক্ষণের তুল্য, সেই ধর্মের ধ্বজাধারীদের কাছে। এখন একটা প্রশ্ন আসতেই পারে তথাকথিত এই আচরণ পালনী ধর্ম এবং আজকের রাজনীতি মানুষকে কী দিচ্ছে? মানুষের কী মানবাধিকার লঙ্ঘিত হচ্ছেনা? দেশময় বেকারত্বের ধিকি ধিকি আগুন আর সমষ্টিবোধ শূন্য মানুষের ত্রাণ ঘটবে কীভাবে? কোন প্রক্রিয়ায় এই মর্মেই এই লেখনীর প্রয়াস।

অধর্মের রাজনীতি

উদে মাছ মারে আর খাট্টাসে তিন ভাগ করে। আজকের বিশ্ব অর্থনীতি আর ভারতীয় অর্থনীতি একই ঘড়িতে চলে। যার নাম মুক্তবাজার অর্থনীতি। কী এই মুক্তবাজার অর্থনীতি?

মুক্তবাজার অর্থনীতি হল পুটি, ট্যাংরা, রুই কাতলের পুকুরে হাঙর চাষ করা। এর ফলাফল খুব সোজা। কর্পোরেটী পোয়াবারো আর দারিদ্র্যের সংক্রমণ। একদিকে বেকারত্বের ধিকি ধিকি আগুন অপরদিকে ক্ষমতার চোখরাঙানি, দাপটকামিতা। আর এই মর্মেই স্মর্তব্য যে, যেখানেই এই অনিয়ন্ত্রিত অর্থনীতি সেইখানের রুটে রয়েছে ধর্মহীনতা। দাপটবাজ ক্ষমতা শোষিত মানুষকে বিভিন্ন সেন্টিমেন্টের আঁতর মাখিয়ে বছরের পর বছর ক্ষমতা দখল করে থাকে। সংস্কৃতিশূন্য, ধর্মরাজহীন, আর্থসমাজের আকাশে বাতাসে মানবাধিকার কান্না করে ফেরে। দাপটকামী ক্ষমতা চায় কর্পোরেটী আনুগত্য, সে চায় গণেশী অর্থনীতির নীতিতে মানুষকে পণ্য করতে।

ধর্মের রাজনীতি

ধর্মের কাজ হল ব্যক্তিগত (কর্পোরেটী কুক্ষিগত) ধনকে আর্থ-সামাজিক সম্পদে পরিণত করা। একটি উদাহরণ নিলে বিষয়টি পরিষ্কার করা যাবে—

মহাভারতে, ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির সমবেতভাবে স্ব-শরীরে স্বর্গলাভ করলেন। স্বর্গে গিয়ে তিনি প্রথমেই দেখলেন দুর্যোধন সেখানে বসে। এর তাৎপর্য কী? দুর্যোধন মানে হল (দুঃ যে ধন) ধন রূপ আবর্জনা, যা কুরুক্ষেত্রের মাঠে পাণ্ডব প্রজ্ঞায় আর্থ-সামাজিক সম্পদে রূপ নেয় যখন তা বায়তুল ফাণ্ড বা আর্থ-সামাজিক ট্রাস্টে অর্পিত হয়। আর তার কর্তৃত্ব থাকে অবশ্যই ধর্মরাজ নেতৃত্বের হাতে মানে মানবতার হাতে। এক্ষণে আমরা যা পেলাম তা হল অর্থনীতি নিয়ন্ত্রণের জন্য যে রাজনীতি তা-ই ধর্ম।

ধর্মের নিরপেক্ষতা

অতঃপর ধর্মনিরপেক্ষতা বজায় থাকলে যে আর্থ-সামাজিক কর্তৃত্ব বা ক্ষমতা দাপটবাজ দুর্যোধনের হাতেই থেকে যাবে তা স্বীকার করতে অসুবিধা হবার কথা নয়। মহাভারতের কুরুক্ষেত্রিক যুদ্ধে পাণ্ডবদের জয় হয়, মানে মানবতার জয় হয় মানে ধর্মের জয় হয়। আর অধর্ম মানে দানবতার অর্থাৎ কৌরবদের পরাজয় ঘটে। তাহলে— ধর্মনিরপেক্ষতা বচনটি কারা, কেন, চালু করে দিয়েছে বুঝে নিতে বাকি থাকার কথা নয়। ধর্ম ও রাজনীতির সম্পর্কটি হল মানুষের মেরুদণ্ড ও পেটের ন্যায়। আর অর্থনীতি হল মানুষের হৃৎপিণ্ড। ধর্ম ও রাজনীতি ভিন্ন নয়, ব্যক্তিগতও নয়, তা হল সমষ্টিগত মানে আর্থ-সামাজিক।

আগামীর চিত্রপট

মনোহর একখানা ফুলের বাগানের জন্য যেমন বাড়ির সামনে কিছুটা জায়গা ছাড়তে হয়, যেমন মেঘমুক্ত আকাশে পূর্ণিমার চাঁধ দেখতে ঘরের বাইরে বরিয়ে আকাশের নিচে আসতে হয়, যেমন, তরী নিয়ে সাগরপাড়ি দিয়ে পাড়ে উঠতে চাইলে লক্ষ্যে অবিচল থাকতে হয়, শস্য ফলাতে যেমন আগাছা দমন করে আছোট জমিকে কর্ষণ করতে হয়, তেমনি আর্থ-সমাজকে স্বর্গরূপ নন্দকানন বানাতে গেলে পাণ্ডবী নেতৃত্বের আয়োজন করতে হয়। ধর্মরাজকে পেতে

মানুষকে স্বরূপ দর্শন করতে হয়, আমিত্বের প্রেম স্পর্শের জন্য সংগ্রাম করতে হয় তার-ই প্রকৃতির সঙ্গে। প্রকৃতির নিয়ন্ত্রণ-ই আর্থ-সামাজিক পাণ্ডবী মেধার জন্ম দেয় যা গোটা আর্থ-সমাজকে নন্দকাননী স্বর্গে রূপ দেয়।।

অধিকার প্রতিষ্ঠা মানে মানবিকতা-দানবিকতার লড়াই

প্রভাস গোস্বামী

আর্থসমাজে ঐতিহ্যিক প্রথাপালন, অর্থনীতি নিয়ন্ত্রণহীন মন গতানুবর্তিক আবর্তিত হয়। গতানুবর্তিক জীবন ব্যবস্থায় তাহলে কেমন আছি? আছি নানা রকম প্রথাপালনী আনুষ্ঠানিকতা, জাতিগত বিভাজন, বর্ণগত বিভাজন, নারী পুরুষে বিভাজন, অঞ্চলগত বিভাজন, ভাষাগত বিভাজন নিয়ে এক একটি দ্বীপ হয়ে আছি অর্থাৎ সেন্টিমেন্ট আক্রান্ত রক্ষ ব্যবস্থায় মানুষের ন্যায় অন্যায়ের জ্ঞান শূন্য। কেন সে জ্ঞান শূন্য– কারণ মানুষ জন্মগতভাবেই রহস্যাচ্ছন্ন। রহস্যাচ্ছন্নতা কেন? তাই প্রথমেই জানা প্রয়োজন মানব সত্তা। মানব সত্তা হল "হ্যা'' ও "না" বা অস্তি ও নাস্তির সংমিশ্রিত রূপ। সত্তায় থাকা না এর বৈশিষ্ট্য হল তাড়না, হঠকারিতা, তাৎক্ষনিকতা, ক্রোধ, ঈর্ষা, হিংসা, মোহ ইত্যাদি।

এই অবস্থায় ডাক দিচ্ছে কেউ নারী স্বাধীনতার তো কেও ডাক দিচ্ছে সঠিক চিকিৎসার আবার এক দল ডাক দিচ্ছে এক ভাষা এক রাষ্ট্র তো কেউ ডাক দিচ্ছে যথার্থ শ্রমের মূল্য পাওয়ার। তাহলে অধিকার চাইছি ভিন্ন ভিন্ন ভাবে। কিন্তু এভাবে কি অধিকার প্রতিষ্ঠা সম্ভব ? সম্ভব যে নয় তা স্পষ্ট। কেন সম্ভব নয় এবার আলোচনায় আসা যাক– কারণ ব্যক্তি নেগেশন তাড়নায় যখন কোনো একটি অধিকার প্রতিষ্ঠার ডাক দেয় তখন অন্য অধিকার গুলো স্বাভাবিক ভাবেই খেই হারিয়ে দেয়। কিন্তু অ্যাফারমেশনের চর্চা করলে আমিত্ব শক্তি বৃদ্ধি পায় ,ন্যায় অন্যায়ের বোধ তৈরি হয়, হালাল হারাম বোধ জাগে। মনে আনন্দ অনুভূত হয়। পরবর্তী প্রেক্ষায় সংগঠিত হয়ে মানবিকতা প্রতিষ্ঠাও সম্ভব হয়।

ব্যক্তির পজিটিভিটির চর্চা না থাকলে সেই আর্থসমাজ (নেগেশনে) কিষ্কিন্ধায় রূপ নেয় যা রামায়ণে উল্লেখিত। ব্যক্তি নেগেশন ও আর্থসমাজ নেগেশন থেকে বেরিয়ে আসার প্রথম সোপান হল নিজ সত্তায় দৃষ্টি নিক্ষেপ। পরে আর্থসমাজ নেগেশন মুক্তি অনেক বেশি সহজ হয়ে যায়। কারণ ব্যক্তি থেকেই সমষ্টিতে রূপ নেয় আর্থসমাজ নেগেশন। আনুষ্ঠানিকতার ধর্ম পালন বা একাডেমিক শিক্ষা নেওয়ার পরও কিন্তু দুর্নীতিবাজের সংখ্যা কিন্তু কম নয়। যদি মনকে নিখুঁতভাবে ব্যাবহার না করা যায় অর্থাৎ সংস্কৃতির চর্চানুশীলন না হয় তাহলে শান্তি রথ প্রতিষ্ঠা হয় না।

মানুষকে পরিশীলিত জীবন যাপন করার জন্য শ্রম দিয়ে উৎপাদন করে শ্রমমূল্য তৈরি করতে হয়। উৎপাদন ও শ্রম শক্তির নিয়মে সমকালীন আবশ্যিক মূল্য ও পুনরুৎপাদন মূল্য বিয়োগ করলে যা বাকি থাকে তা উদবৃত্ত মূল্য। এই মূল্য আর্থসামাজিকীকরণ হবে কীভাবে– তার জন্য প্রয়োজন নিয়ন্ত্রিত অর্থনীতি। জীবনকে উন্নত করার জন্য প্রকৌশল ও কৃৎকলা নির্মাণই হল রাজনীতি। শ্রমমূল্য-আবশ্যিক মূল্য-উদবৃত্ত মূল্যের বাস্তবানুগ বিন্যাসেই নেতৃত্ব তৈরি হয় । এই নেতৃত্বই আর্থসমাজে বিকাশ ও শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে পারে । এই প্রসঙ্গে জানা দরকার – মানুষ যখন ঔচিত্য সচেতন তখন সে নাগরিক, যখন মূল্যের বিনিময় সচেতন তখন সে আর্থসামাজিক আর যখন মূল্যের অধিকার সচেতন তখন সে আর্থসমাজ-রাজনৈতিক। দ্বান্দিকতায় মনকে পবিত্র বা নিয়ন্ত্রিত রাখলে মূল্যের বিভাজন ও উদবৃত্ত মূল্য অর্পণের যথা ব্যবস্থাপনা ও পরবর্তী পদক্ষেপ নেওয়া যায়। অর্থাৎ চেতনার বিকাশ হলে পুঁজি কুক্ষি করার মানসিকতার দিকে ধাবিত হয় না, দারিদ্র্যের সংক্রমণ ঘটেনা ,সমাজ থেকে শান্তি হারায় না, মানবিকতা প্রতিষ্ঠা হয়।

রক্ষণকামিতার হরেক বোল

মিনারুল হক

রক্ষণকামিতা বস্তুবিজ্ঞানকে যুগে যুগে মানবজীবন থেকে আড়াল করতে নামিয়ে আনে নানান ধরনের ঢাল, বোল, এবং কুহেলিকা। জ্ঞান-দর্শন মানব জীবনে প্রতিষ্ঠিত হলে তার জায়গা থাকবে না তাই সে মানবঢালী কুহেলিকার জাল বিস্তার করে। যাতে মানুষ রক্ষকে চিনতে না পারে তথা মানুষ তার আর্থসামাজিক শত্রুকে শনাক্ত করতে না পারে। তাই আমাদের জানা দরকার রাক্ষস রাবণ কীভাবে বস্তুবিজ্ঞানকে বিভিন্ন মোড়কে বেঁধে ফেলে। মোড়কের বৈশিষ্ট্যগুলিকে বিশ্লেষণ করা যাক—

ধারণার সংক্রমণ

মানুষ যাতে তার নিজ দেহমনের প্রতিবন্ধকতাকে আইডেন্টিফাই না করে তার ঢাল হিসাবে রক্ষণকামিতা প্রথমেই মানুষের জীবনের স্রোতবহতাকে রুদ্ধ করে জ্ঞান-দর্শনকে জীবন থেকে মাইনাস করতে নানান ধরনের ধারণার সংক্রমণ করে। যেমন— তুমি কর্ম করো, ফলের আশা করোনা। দেখবে একদিন না একদিন ফল পাবেই। পূর্ব পুরুষের কথা মেনে চলো, কখনোই তাদের বিরোধিতা করবে না। ক্ষমতার ইন্দ্রপুরে নজর দেবে না। কোনো প্রশ্ন করবে না। কেবল দাসত্বের আনুগত্য। এইভাবে রক্ষকামিতা মানুষের পরিবার, দাম্পত্য জীবন, সমাজ, অর্থনীতি, সংস্কৃতি, ইতিহাস, সাহিত্য, পরকাল—প্রভৃতি নিয়ে ধারণার জটাজাল বিস্তার করে। ব্যক্তিকে সেই জালের ফাঁদে ফেলে দিয়ে ধারণা ভিত্তিক মানুষের চিন্তা-চেতনাকে আবর্তিত করাতে থাকে। মানুষ সেখান থেকে জীবনে চলার নীতিমালাকে বাছাই করতে পারে না। ফলে জীবন থেকে মানুষ ধারণার মোড়কে উৎপাটন করতে পারে না। এমন ধারণাকে বহন করতে থাকে, তার জীবনের বোঝা বাড়তে থাকে। তার উত্তর প্রজন্মেও সেই বিশেষণ সংক্রামিত হয়।

নীতিহীন রীতির আনুষ্ঠানিকতা

জ্ঞান-দর্শন যুগে যুগে ইতিহাস সৃষ্টি করেছে। মানব সভ্যতা বসন্তের মাদলে ছন্দায়িত হয়েছে। কিন্তু তা দানবিক অসুরের সহ্য হয়নি। সে ইতিহাসকে বেড়ি পরাতে বিভিন্ন ব্যারিকেড খাড়া করেছে। যেমন— মিশরে খ্রিষ্টপূর্ব যুগে হযরত মুসার (আঃ) নেতৃত্বে ফ্যারাও এর অত্যাচার থেকে ইহুদিদের মুক্ত আর্থসমাজের গঠনের ইতিহাস। যেই হযরত মুসা (আঃ) দেহত্যাগ করলেন, শুরু হয়ে গেল নীতিহীন অযৌক্তিক রীতির আনুষ্ঠানিকতা। হযরত মুসার লাঠিকে সাপ বানানোর গল্প-কাহিনী ফাঁদা হল। লাঠির আঘাতে নীলনদের পানি দুইভাগ হয়ে যাওয়ার গল্প—প্রভৃতি। সেখানে ইহুদ তত্ত্বকে ভুলিয়ে দিতে শুরু হল এই সব কাণ্ড।

বৈদিক ঋষিরা যে জ্ঞান-দর্শন মানবতাকে উপহার দিলেন,সেই জ্ঞানের রাজনৈতিক প্রয়োগ হয়নি। তা সত্ত্বেও রক্ষণকামিতা সেই জ্ঞান-দর্শনকে এতই ভয় পেল যে তাকে নানান অনুষ্ঠানে বেঁধে ফেলল। বস্তুবিজ্ঞানের চর্চা থেকে মানুষকে গোলক ধাঁধায় ঘোরাতেই থাকে। যে আচার-সংস্কারে মানুষ নিজেকেই হারিয়ে ফেলেছে।

আতঙ্ক ছায়ার সংক্রমণ

ব্রাহ্মণের সেবা না করলে পরের জন্মে পশু হয়ে জন্মাবে, স্বর্গ পাবে না, বেহেস্ত পাবেনা— ইত্যাকার জ্ঞান-দর্শনহীন আচার অনুষ্ঠানের মাধ্যমে মানুষের মধ্যে বিচিত্র রকমের আতঙ্ক খাড়া করেছে রক্ষণকামিতা। যাতে মানুষ আতঙ্কিত হয়ে অন্ধকার ও জঞ্জাল জীবন থেকে সাফ করতে না পারে। নোংরাই ঘাটতে থাকে, রক্ষের সেবা করতে থাকে। ভীত-সন্তস্ত্র হয়ে আল্লাহ-রাসুল, ঠাকুর-দেবতার নাম জপ করতে থাকে। এগুলোকে জানার বস্তুগত প্রয়াস যেন না আসে। গবেষণায় যদি ঐ সকল বিষয় চলে আসে,আর মানুষ যদি জীবনের সাথে বস্তুভিত্তিক সম্পর্ক গড়ে ফেলে, তাহলে তো শয়তানের তথা রক্ষণকামিতার জারিজুরি সব বেরিয়ে যাবে। তার ছড়ি ঘোরানোর উপায় থাকবে না। ট্যালেন্টের সৃষ্টি হয়ে যেতে পারে।

ট্যালেন্টের কাছে তো তার রেহাই থাকে না। অতএব খাড়া করো আতঙ্ক। যে আতঙ্কে রক্ষ অধর্মকেই ধর্ম বলে চালাতে পারে।

বুজরুকি চালের ভাগ্য লঙ্কা

ধারণা অন্ধত্বের হরেক কাণ্ডকারখানার নাম হল বুজরুকি চাল। জীবন দর্শন মানুষকে আত্মবিকাশের প্রেরণার জোগায়। সেই জ্ঞান-দর্শনকে খণ্ড খণ্ড করা রক্ষণকামিতার ঢাল, যা বুজরুকি। অনিয়ন্ত্রিত দেহমন নানা রোগে আক্রান্ত হয়। রক্ষণকামিতা সেখানে তাবিজ -কবজ, মাদুলি, তসবী আমদানি করে। মানুষ যাতে এর কারণগুলির সন্ধান না করে তাই। খণ্ড খণ্ড করে জীবনের সকল সমস্যাকে দেখতে থাকে, রহস্যের সাগরে ডুবে হাবুডুবু খায়। জীবনে তালগোল পাকিয়ে যায়। রক্ষণকামিতা মৌজ করে।

মানব জীবনের চেতনার উর্দ্ধোগমনের নিয়ম অখণ্ড। ভারতীয় জীবন দর্শন, আল কোরানিক জীবন দর্শন সেই দিকেই নির্দেশ করেছে। কিন্তু রক্ষণকামিতা মানব জীবনকে ভাগ ভাগ করে দেখায়। আর তাতে সমস্যার খেই ধরতে না পেরে জীবন হয়ে যায় লঙ্কা অর্থাৎ বস্তুবিচ্ছিন্ন। এই বস্তুবিচ্ছিন্নতায় ব্যক্তি, সমাজ, রাজনীতি, ধর্ম, অর্থনীতি সব খণ্ড খণ্ড। অথচ মহাভারতে দেখানো হল খাণ্ডব বন দহন করেই অর্থাৎ জীবনের শান্তি ভোগ বাস্তবায়িত করতে হয়।

ছাঁচে ঢালাই করা জীবন

আর্থসামাজিক রক্ষ মানব জীবনকে এক একটা ছাঁচে ফেলে দেয়। অর্থাৎ ব্যক্তি মানুষ প্রত্যেকেই আমরা এক একটা কুয়োঁ খুঁড়ে নিই নিজের মত করে। সেই কুয়োতে নিমজ্জিত হতে সমাজ রক্ষণকাম মওকা দেয়। আটকে যায় ব্যক্তি তথা সমাজ জীবনের গর্তে। আত্মকেন্দ্রিকতার গুহা থেকে প্রত্যেকেই জীবন চালাতে থাকে, সমাজ জীবনের সমস্যাগুলি যতক্ষণ না তার ব্যক্তি ও পরিবার জীবনকে সংক্রামিত করছে, তার আগে কোনো চেতনার প্রসারণই আসে না। ব্যক্তি নিজ ও পরিবারের বাইরে নজর দেয় না। নজর যাতে না পড়ে তার জন্য রক্ষণকাম মানস নানা চক্রান্তে তাকে জড়িয়ে রাখে। যেমন— দাম্পত্য জীবনের ছাঁচ, পাত্রপাত্রী নির্বাচনের ছাঁচ— প্রভৃতি।

সন্ত্রাসী বাতাবরণ

মূল্যকুক্ষির রাক্ষিক মানসিকতায় প্রতিনিয়ত ধন হারাবার ভয় থাকে। সেই ভয় থেকেই সে আর্থসমাজে ভয়ের বাতাবরণ সংক্রমণ করে। রক্ষের শাসন-শোষনের যন্ত্রণা থেকে মানুষের মনে একটু আধটু প্রশ্ন জাগলেই রক্ষ সন্ত্রাসী বাতাবরণ নামিয়ে আনে। আবার তাদেরকে শম্বুকী আত্মগুহায় ঠেলে দেয়। কিন্তু আর্থসামাজিক ট্যালেন্টকে কখনোই আটকাতে পারে না। মানুষ মেধাচার্চিক হয়ে উঠলেই রক্ষকেই পিছু হঠতে হয়। ইতিহাস যুগে যুগেই সে সাক্ষ্য প্রদান করে।

বলিহারি আহামরির আইকন

সমাজ মনকে আসুরিক মুঢ়ত্বে আষ্টেপৃষ্টে বেঁধে ফেলতে রক্ষ সমাজের শোষিত, বঞ্চিত, অবহেলিতদের মধ্য থেকে একজন করে আইকন খাড়া করে। সেই ফিগারের দিকে মানুষ যাতে জুলজুল করে তাকিয়ে আহামরি-বলিহারি করতে থাকে। রক্ষণকাম আড়ালে মুচকি হাসে। শোষণের পথকে মসৃণ করে। অধিকার বঞ্চিত মানুষরা সব কিছু গুলিয়ে ফেলে। কল্যাণ-অকল্যান, ভাল-মন্দের পার্থক্য করতে পারে না। ফলে আর্থসমাজ সমস্যার জট ছাড়াতে পারে না। ড্রাগন তখন চালু করে পুরস্কার ও ব্যক্তি পূজার ঝাড়বাতি।

কর্ষণহীন সংস্কৃতির নামে অপসংস্কৃতির সংক্রমণ

সংস্কৃত শব্দটির অর্থ হল নিজেকে শুদ্ধ করা বা পবিত্র করা। প্রতিনিয়ত নিজেকে পুনঃগঠনের মাধ্যমে চেতনার উর্দ্ধগমন ঘটানোর প্রক্রিয়ার নামই হল সংস্কৃতি। এর অন্যতম প্রযুক্তি ফাইন আর্টস। যাতে নিজ মনের ক্যানভাসরূপ আয়নাতে মানুষ নিজেকে বারংবার দেখে নিতে পারে। সেই ভিত্তিক কর্ম প্রয়াস শুরু করে। কিন্তু সেই প্রয়াস যদি বস্তুবিজ্ঞানের নিরিখ বা গাইডলাইন ফলো না করে, তা প্রশংসা, সুনামের কাঙালিত্বে পরিণত হয়। বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গী ছাড়া কোনো সাহিত্য, কবিতা, নাটক চিত্রকলা অনুধাবন করা সম্ভব নয়। সাহিত্য-সংস্কৃতির নামে শুভ-অশুভের পৃথকীকরণহীন, লেখক-পাঠক-দর্শক কারুর চেতনার বিকাশে সহায়তা করে না-এরূপ যা-কিছু তা শিল্প-সংস্কৃতি নয়। সংস্কৃতির নামে এগুলি চেতনায় ধারণার সংক্রমণ করে। ফলে তাতে ব্যক্তি ব্যক্তি সত্তাকেও দেখতে পায় না, সমাজসত্তাকেও চিনতে পারে না।

যেমন— বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রতি বছর হাজার হাজার পিএইচডি ডিগ্রিধারী বেরুচ্ছে, কই তারা তো আর্থসামাজিক সমস্যার সমাধান দিতে পারছে না।

আদর্শকে জীবন থেকে আড়াল করা

গৌতম বুদ্ধ জীবনগত সমস্যার সাধনায় সাধিত জ্ঞানে সমকালীন আর্থসমাজকে মুক্তির দিশা দিলেন। রক্ষণকাম বুদ্ধকে নাস্তিক বলে দেগে দিলো। কিন্তু যেই তিনি দেহত্যাগ করলেন, তখন রক্ষণকাম বৌদ্ধ জ্ঞান দর্শনকে আড়াল করতে গৌতমকে অবতার বলে ঘোষণা করে দিল। মানব জীবনকে বেঁধে ফেলল ধারণার বেড়াজালে। একই ভাবে ভারতীয় উপমহাদেশে রক্ষণকামের বিরুদ্ধে আর্থসামাজিক বন্ধ্যাত্ব কাটাতে চৈতন্য প্রেমের বাণী নিয়ে হাজির হন। তা দেখে রক্ষণকাম প্রমাদ গুনলো। শুরু হল চক্রান্ত। যে ষড়যন্ত্রেই তাকে হারাল মানবতা। প্রেমসূচক তত্ত্বকে জীবন থেকে আড়াল করতে খোল করতাল ধরিয়ে দিল তার অনুগামীদের হাতে। তারা আজ দুহাত তুলে তত্ত্ব ভোলার বলিহার বোল গেয়ে চলেছে।

ইতিহাস বিকৃতি ও তথ্য লোপাট

দশমাথা রাবণের দশ মুখে ছলাকলা আর ঢাল-বোলের অভাব ঘটে না। যুগে যুগে তা পালটায়। কখনো ধারণা, কখনো সন্ত্রাস, তো কখন দর্শন বিকৃতি ও লোপাট। অপকর্ম চালাতেই থাকে। জ্ঞানের শক্তিকে তার সবকালেই ভয়। যে কারণে ৬৩০ এর মক্কা বিজয় ও পরবর্তী ৬৬১ সাল অর্থাৎ হযরত আলির মৃত্যুর আগে পর্যন্ত আর্থসমাজ পরিচালনার ইতিহাসকে গিলে খেলো। পশ্চিমি গবেষকরা বলেন যে ঐ সময়ের বিপ্লবের কোনো সোর্স তারা পাচ্ছেন না। মোয়াবিয়া-এজিদের মাধ্যমেই তা সংঘটিত হয়। যারা সেই ইতিহাস গিলে খেলো, তারা বিপ্লবের জ্ঞান-দর্শনে বিকৃতি করল কিনা তার গ্যারান্টি কে দেবে? শুরু হল তখন থেকে ধারণাভিত্তিক আনুষ্ঠানিকতার ঢল। যা আজও বিদ্যমান। তত্ত্ব উঠেছে তাক-এ, আমরা করছি ধর্মপালনের জৌলুসি জালসার জমজমাট আয়োজন।

শোষণ ভুলাতে রঙবাহারি প্রলেপণ

মানুষের শোষণ যন্ত্রণা ভুলাতে আর্থসমাজ জীবনে রক্ষণকামী অপশক্তি রঙচঙে, বাহারি নানান প্রথা-অনুষ্ঠান ও রীতির সংক্রমণ ঘটায়। জীবনের নীতিমালাকে দূর করে কুহেলি জালের ট্রাডিশন ও চমকবাহারি বিলাসে মানুষকে এক একটা দ্বীপে বন্দি করে। মানুষ পরস্পরের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। অনুষ্ঠানের আড়ালে রক্ষণকাম লুকিয়ে পড়ে। আমরা আবর্তিক ধর্ম পালনের নেশায় মেতে যায়। পাথরে মাথা ঠুকে ঠুকে মানুষ পাথর হয়ে যায়। রক্ষণকামী ধারণার নামাবলি সত্তায় চাপাতে থাকি। কলুর বলদের মত ঘানি টেনে চলি, কিন্তু তা থেকে কোনো তেল নিঃসৃত হয় না। কেননা সেখানে তো ঈপ্সিত ফলের জন্য প্রয়োজনীয় ফসলেরই যোগান নেই।

কুহকি মিথে (Myth) জ্ঞান দর্শনকে মোড়ানো

মানব জীবন হল সহজ-সরল। নিয়মের সারল্যকে একেঁ বেঁকে দেওয়ায় হল রক্ষণকামের কাজ। এরজন্য সে হেন ফন্দি নেই, যা আঁটে না। এই ফাঁদ পাততে সে জীবন দর্শনের উপর মিথ খাড়া করে। যুক্তিহীন, অবাস্তব সব কুহকি জাল ছড়ায়। যেমন— আর্য ঋষিরা যে প্রতিমার বর্ণনা পুরাণে দিলেন, রক্ষণকামিতা তা কল্প-কাহিনির মিথে জড়িয়ে ফেলেছে। দূর্গা, লক্ষ্মী, গণেশ, কার্তিক, সরস্বতী, বিশ্বকর্মা, শিব, কালী— প্রতিমার বস্তুস্বরূপ আড়াল করে রক্ষ তা কেবল আনুষ্ঠানিক প্রতিমা-প্রতীকে পর্যবসিত করেছে। সে একই কাণ্ড করেছে ইতিহাস স্রষ্ঠা রাসুল্লাহর জীবন চরিত নিয়েও। ইসলামের অখন্ড জীবন বিধানকে আনুষ্ঠানিকতায় বন্দি করে তাকে তথাকথিত ধর্ম-খাঁচায় পুরে ফেলেছে।

অন্ধত্বের বোল ও দুর্বলতার কোল

বস্তুগত জীবন চর্চায় মানুষ যাতে প্রভাবিত না হয় সেজন্য রক্ষ কিছু বোলের আমদানি করে। যেই কেউ বস্তুর কথা বলে তারা সেই বোলের গোলে ফেলে দেয় মানুষকে। যেমন— সমাজের জটিল অবস্থায়, তুমি কী করবে, এসব তোমার আমার মত লোকের পক্ষে কিছু করা সম্ভব? আমাদের এভাবেই চলতে হবে। একদিন কেউ করবে এর সমাধান। আমরা সাধারণ মানুষ, অতসত বুঝি? —ইত্যাদি। এভাবেই সে মানব মনে অন্ধত্বের বোল কাটে। তাদের কে দুর্বল করে নিয়তি নির্ভরতায় ঠেলে দেয়। মানুষ নিজ সত্তার প্রতি সচেতন হয় না। কোনো শক্তিও পায় না।

নাস্তিককে আস্তিক আর আস্তিককে নাস্তিক তকমা

সমাজের শান্ত-শিষ্ট, অধিকার ও রাজনীতি সচেতনা নিয়ে কোনো প্রশ্ন না তোলা ব্যক্তি মানস রক্ষের কাছে আস্তিক। রক্ষণকামের গায়ে কোনো দাগ কাটে না তারা, তাই রক্ষণকামও তাদের মিষ্টি মিষ্টি কথা বলে। তোমরা ধার্মিক। তোমাদের তথাকথিত ধর্মপালনে আমরা সর্বদা পাশে আছি। কিন্তু যারা এই গতানুবর্তিক আর্থসমাজে প্রশ্ন করে, মানুষের অধিকারের কথা বলে, সাংস্কৃতিক আত্মকর্ষণের বার্তা দেয়, রাজনীতি সচেতনায় প্রভাবিত করে— তাদের রক্ষণকাম নাস্তিক বলে তকমা দেয়। যদি মানবতা সেই সচেতনায় জেগে যায়, তবে তো তাকে লুকাতে হবে। তার ফাটকাবাজি ও জাদুকরী ছুমন্তরের জারিজুরি আর খাটবে না। কিন্তু বস্তু নিরিখে আস্তিক হল সত্তানিহিত আমিত্ব বস্তুর প্রতি প্রেম নিবেদন করা, ইতিবাচকতার নিয়ন্ত্রণে থাকা,তার কাছে নিজেকে সমর্পিত করা, তার নিয়মের বাইরে না যাওয়াটাই আস্তিকতা। যারা এই 'আমি' কেই মেনে চলতে চায় না, আমিত্ব বস্তু তথা ইতিবাচকতাকে অস্বীকার করে, বস্তুর নিয়মে নিয়মানুগ নয়, তারাই নাস্তিক। ভারতীয় জীবনধারার ঋষিরা বললেন বেদ বিরোধিতা করা মানে নিজেকেই বিরোধিতা করা অর্থাৎ 'আমি' র নিয়মানুগ না হওয়া।

অবতার খাড়া করা

রাক্ষুসে আর্থসমাজ কাঠামোকে ভেঙে দেওয়ার মৌলিক প্রশ্ন উত্থাপিত হলেই রক্ষের মাথায় বাজ পড়ে। প্রথমে তাকে পাত্তা দেয় না। কেননা পাত্তা দিলে সমাজে তার প্রভাব বেড়ে যাবে। তাতেও কাজ না হলে পুরস্কারের বোঝা চাপিয়ে তাকে বাগে আনতে চায়। তাও যদি না হয় শুরু করে ষড়যন্ত্র। তাতেও যদি কোনো ফল না আসে। তখন সমাজের কাছে তাকে অবতার রূপে দাঁড় করায়। এর উদাহরণ ইতিহাসে— বিবেকানন্দ, রামকৃষ্ণ প্রমুখ। আর্থসমাজের ভক্তির চাপে শক্তির স্ফুরণ আর থাকে না। রক্ষণকাম আড়ালে লুকিয়ে লুকিয়ে তার মজা লুটতে থাকে।

মানবতাভিত্তিক রাজনীতির চর্চা শুরু হলে অপক্ষমতার দাপাদাপি ক্রমশ বাড়তে থাকে। সে এতটাই আধিপত্যের দাপটকামনায় কিলবিল করতে থাকে যে সে হত্যালীলা চালিয়ে নরমুণ্ডের মালা গলায় পরতে থাকে। যার ঐতিহাসিক উদাহরণ জার্মানির হিটলার। ইহুদী নিধনে কনসেনট্রেশন ক্যাম্পে বহু ইহুদিকে হত্যা করেছে। বহু মেধাকে হত্যা করেছে। সেই দাপটের পরিণাম কী হয়েছে— শেষে তাকে আত্মহত্যা করতে হয়েছে। যা ভারতীয় ঋষিরা অনেক আগেই দেখিয়ে ছিলেন যে সন্ত্রাসী আধিপত্য কামনার চরম পরিণাম ছয় হাতা ছিন্নমস্তা কালী প্রতিমাকে দেখলেই অনুভূত হয়। যে নিজের মাথাটিকে নিজেই দেহ থেকে ছিন্ন করেছে।

অধর্মকে ধর্ম আর ধর্মকে অধর্মের রূপ দান

মানবতার বিকাশ তথা অস্তিত্বের বিকাশে যে নীতি মানুষকে প্রেরণা জোগায় এবং বিকশিত করে, কোনো প্রতিবন্ধকতা খাড়া করে না, সেই নিয়মই মানুষের ধর্ম। যাতে আর্থসমাজ নান্দনিক সুর ছন্দে ছান্দিক হয়। বেজে উঠে সরস্বতীর বীণা। আর্থসমাজে প্রতিষ্ঠিত হয় শান্তির বাতাবরণ। যা মানবতার বিকাশে বাধা দেয়, মানবতাকে লাঞ্ছিত করে, বঞ্চিত করে, বন্দি করে রক্ষণকামী দাসত্বের বন্ধনে, তা-ই অধর্ম। যাতে মানুষের জীবন হয় জটিল, বক্র।

আর্য ঋষি মানুষের স্বাভাবিক প্রবণতার প্রকৃতি বিশ্লেষণে চারটি অংশে ভাগ করলেন। বললেন—১। ব্রাহ্মণ— যারা ব্রহ্মার মুখ থেকে জাত। প্রকৃতি হল ব্রহ্ম জ্ঞান চর্চা করা। ২। ক্ষত্রিয়— যারা ব্রহ্মার কাঁধ থেকে জাত। প্রকৃতি হল রাজনীতির প্রতিষ্ঠায় তথা নেতৃত্বদানে পারদর্শী। ৩। বৈশ্য— ব্রহ্মার বাহু থেকে জাত। প্রকৃতি হল বুদ্ধি বৃদ্ধিতে পারদর্শী। ব্যবসার ক্ষেত্রেই আগ্রহী। ৪। শূদ্র— বক্ষার জানু বা পদদ্বয় থেকে জাত। প্রকৃতি হল চিন্তা-ভাবনা না করতে পারা, কেবলমাত্র দেহশ্রমে পারঙ্গম। কিন্তু তারা কখনোই একথা বলেননি যে এই গোত্রে যারা পড়ে তাদের পরবর্তী প্রজন্ম বংশানুক্রমিকভাবে সেই ভাগেই পড়বে। মানুষের চেতনা কর্ষণেই তা পরিবর্তন সাপেক্ষ। কিন্তু সেই নিয়মকে আজ ছাঁচে ঢালাই করেছে বংশানুক্রমিক জাতিভেদ প্রথায়। যা ধর্মের নামে অধর্ম। আর তা যুগ যুগ ধরে মানিয়ে নেওয়ার আতঙ্কের রীতিও চালু করে দিয়েছে।

আলকোরানিক অখণ্ড জীবনবিধানের আর্থসামাজিক প্রযুক্তিকে একইভাবে অতীতমুখীন প্রথায় পর্যবসিত করা হয়েছে। যার নাম দেওয়া হয়েছে ধর্ম।

উন্নয়ন পরিকল্পনা – আর্থসমাজ ও প্রশাসনের ভূমিকা

শ্যামল কান্তি পাড়ুই

মানুষকে মর্যাদার সঙ্গে বাঁচতে সহায়তা করার থেকে পুণ্য কর্ম আর কিছু আছে কিনা আমার জানা নেই। কিন্তু কীসে মানুষের মর্যাদা বৃদ্ধি পায় তা না জানলে মানুষকে সহায়তা করতে গিয়ে ভালোর থেকে খারাপ হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা থেকেই যায়। সুযোগ থাকলে সম্ভবত সব দেশেই, সরকারি, বেসরকারি মাধ্যমে অনেক দরকারি কর্মসূচি নেওয়া হয় গরীবি মোচনের লক্ষ্য নিয়ে। তথাপি গরীব মানুষের অবস্থান নিয়ে বিতর্কের অন্ত নেই। আর্থসামাজিক উন্নয়নের পরিকল্পনাকার, রূপকার, ধারক বাহক সঞ্চালক কে? বা কারা?

সাম্প্রতিক একটি রিপোর্ট থেকে জানা যাচ্ছে ক্ষুধার মাপ কাঠিতে ভারতের অবস্থান আরও খানিকটা নেমে গেছে। সামাজিক মাধ্যমে এই নিয়ে প্রভূত চর্চা। সত্যিই কি দারিদ্র্য বেড়ে গেল আমাদের দেশে ! না খেতে পাওয়া মানুষের সংখ্যা কি হু হু করে বাড়ছে? ভাবনার বিষয় বটে। আমাদের মতো ক্ষুদ্র নগণ্য সাধারণ মানুষের ক্ষেত্রে এর তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ হয়তো সম্ভব নয়। বাস্তব অভিজ্ঞতার নিরিখে কিছু পরিস্থিতি তুলে ধরার চেষ্টা করতে পারি মাত্র।

প্রায় ৩২ বছর পর নিজের প্রত্যন্ত গ্রামে গিয়েছিলাম এবার পুজোর ছুটিতে। পুরনো কিছু দরকারেই বেশ কয়েক দিন অনেকটা সময় কাটল সেখানে। ফেলে আসা শৈশব মনে পড়ছিল। এখনও সুবল জ্যাঠা বেচে আছেন। বেশ ভালো আছেন, ছেলেদের দোতলা পাকাবাড়ি হয়েছে। মেয়েদের বিয়ে হয়েছে বেশ ভালো পরিবারে। নাতি নাতনি ছেলে বউমাদের নিয়ে ভরপুর পরিবার। অথচ কি দূর্বিষহ দারিদ্র দেখেছি আমাদের ছোটবেলায়। ঘরে ৯টা পেট, ক্ষেতে সারা দিনের পরিশ্রমে সাকুল্যে জুটেছে কেজি খানেক আটা বা মোটা চাল। কোনোদিন বা তাও জুটেনি। তাই দিয়েই অর্ধাহারে বা অনাহারে কেটেছে দিন রাত। তার পর সরকারের বর্গা কর্মসূচির ফলে কিছুটা চাষ জমি মিলেছিল ওদের। অবস্থা বদলের শুরু সেখান থেকেই বলা যায়। শুধু সুবল জ্যাঠা নয়, আমার পাড়ায় এখন ১০০ লোকের বাস। সবারই মাথা গুজার পাকা ঠাঁই হয়েছে। খাওয়া পরার অভাব আছে কারো তা বলা যাবেনা। ছেলে মেয়েরা স্কুল কলেজ যাচ্ছে। এতো বদলের পরও ভাবি এই যে পরিবর্তন, এর জন্য সরকারের চালু দারিদ্র দূরীকরণ কর্মসূচিগুলোর ভূমিকা কতটা। আদৌ আছে কিছু, নাকি নগণ্য? বাস্তবে দেখি সুবল জ্যাঠার দুই ছেলের দুটো বেশ চালু বড়সড় ইমারতি কারবারের দোকান। কয়েক লক্ষ টাকার ব্যবসা। সরকার তো তাকে এর জন্য কোনো প্রশিক্ষণ বা অনুদান দেয়নি। একটু খোলা চোখে দেখলে এটা বুঝতে অসুবিধা হয় না সরকারের ভূমিকা এখানে নেহাতই পরোক্ষ সহায়কের। যত ছোট বড় মাঝারি ব্যবসাদার, কারবারি রয়েছে সারাদেশ জুড়েই, সরকার তাদের জন্য অনুকুল পরিবেশটুকু সৃষ্টি করতে সহায়তা করাছাড়া আর কী করেছে? সেই ব্যবস্থাটুকু যদি ঠিক ঠাক থাকে তাহলেই অনেকে নিজের অবস্থা বদলে নিতে পারে নিজেই। আমাদের দুর্ভাগ্য প্রচলিত ব্যবস্থায় পড়ে মানুষের অবস্থা ফেরানোর সেই পরিধিও সংকুচিত।

এ তো গেল এক চিত্র। কিন্তু এখনও সমাজের প্রান্তিক মানুষ, বিশেষ করে তপশিলী, আদিবাসি, পিছিয়ে পড়া সহায় সম্বলহীন, সম্পদহীন মানুষের সংখ্যাও তো কম নেই। বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, ঝাড়গ্রাম, ইত্যাদি জঙ্গল মহলের প্রান্তিক মানুষদের দুয়ারে গেলে গরীব মানুষের দেখা পাবেন। যদি দেখার চোখ থাকে, ভাবার মতো অনুভুতিপ্রবণ মন থাকে। তারা হয়তো অল্পেই তুষ্ট। পরিতৃপ্ত নিষ্কলুষ মন আপনাকে হয়তো হতবাক করে দেবে তাদের অকৃত্রিম ভালোবাসায় আদরে সম্মানে। যদিও নুন আনতে পান্তা ফুরানো সকাল তাদের বদল হয় না সহজে।

দারিদ্র্য নিয়ে গবেষণা করে অনেক বিখ্যাত ব্যক্তি আরও প্রখ্যাত হয়েছেন বা হচ্ছেন। কিন্তু হাসিম শেখ রামা কৈবর্তদের সঙ্গে সরস্বতী মুর্মু, শেফালি টুডুদের

অবস্থার বদল হচ্ছে কি? হলেও কতটা? বা এই বদলের অভিমুখ কোন দিকে? এ প্রসঙ্গেই আলোচনা ক্রমে কিছুদিন আগে এক উচ্চ পদস্থ আমলা বলছিলেন– সরকার এতো যে দারিদ্র্য দূরীকরণ কর্মসূচি মহাআড়ম্বরে লালন পালন সঞ্চালন করে চলেছে দীর্ঘ দিন ধরে, তার প্রতিফলন কোথায়? আমরা সত্যিই কি দারিদ্র্য চিনতে পেরেছি? বুঝতে পেরেছি গরিব মানুষের কী প্রকৃত প্রয়োজন ? তাঁর এই কথাগুলো শুনে আমার মনে হচ্ছিল বলি –আপনারা তো হচ্ছেন সেই ঐতিহ্য বন্দি উচ্চবংশীয় আমলাকুল, একবার নিজেদের দিকে তাকিয়ে দেখুন না স্যার, তাহলে হয়তো কারণগুলো কিছুটা খুঁজে পাবেন। আপনাদের দেখা গরিব মানুষ মানে তো গবেষণা পত্রে, নইলে বইয়ের পাতায় অথবা খবরে কাগজে বা কোনো তথাকথিত প্রতিবেদনে। নিজেদের অবস্থান, দায়িত্ব, ভূমিকা নিয়ে কি ভেবেছেন কখনও? গরিব মানুষ যারা দেখলই না তারাই গরিব মানুষের উন্নয়নের জন্য পরিকল্পনা বানায়। যদিও ইদানিং কালে উপর থেকে চাপিয়ে দেওয়া পরিকল্পনা না করে নীচে থেকে উঠে আসা পরিকল্পনার কথা বলা হয় খুব চিৎকার করে। বাস্তব কিন্তু অন্য কিছু দেখায়। বিশেষ করে প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাপনায় উন্নয়ন প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে। তোমার উন্নয়ন আমার হাতে। তুমি পরিকল্পনা করতে পারো কিন্তু অনুমোদন দেবো আমি। তদারক করবো আমি। মনোভাবটা এই, তুই কী বুঝিস? গরীব, নিরক্ষর পিছিয়ে পড়ার দল তোরা কী বুঝিস? ওরা সত্যিই কি কিছুই বুঝেনা? তা না বুঝুক ,ক্ষুধার জ্বালাটা তো বোঝে। না খেতে পাওয়ার যন্ত্রণা কি আপনি বোঝেন? লাঞ্ছিত আপমানিত হওয়ার অনুভুতি কি আপনার হয়েছে কখনও? মানুষের আত্মমর্যাদায় আঘাত লাগলে সে কতোখানি ভয়ংকর হতে পারে সম্প্রতি মুরশিদাবাদে জিয়াগঞ্জের শিক্ষক পরিবার হত্যাকান্ড তার কলঙ্কজনক উদাহরণ (যদি আততায়ীর বক্তব্য সত্য হয়)।

প্রশ্ন হচ্ছে, সাধারণ মানুষ মর্যাদার সঙ্গে উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় নিজেকে যুক্ত করার সুযোগ পেয়েছে কতটা ? উন্নয়ন যাদের জন্য, তারাই যেন এই কর্ম যজ্ঞের শ্রমিক। আর মহা পণ্ডিত, প্রভূত শক্তিধর আমলা, রাজনীতিবিদ নীতি নির্ধারকের দল এই উন্নয়নের মালিক। কথাগুলো এমনি এমনিই কারো প্রতি বিদ্বেষ প্রসূত লিখে ফেললাম এমনটা একেবারেই নয়। দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতা, পর্যবেক্ষণের নিরিখেই মনে হল তাই লিখলাম। অনেক দিন আগে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর স্তরে পড়া একটা সমালোচনার কথা এখন খুব মনে পড়ে– সেই সমালোচনাটির ইংরেজি লাইনগুলো বাংলা করলে দাঁড়ায় এই রকম– 'আমলাতন্ত্র উন্নয়নের এক বড় অন্তরায়।' পরবর্তী সময়ে কর্মজীবনে দেখেছি এই বক্তব্যটি মাঝে মাঝেই চিৎকার করে জানান দিচ্ছে তার অস্তিত্ব। তাই নতুন ব্যবস্থাপনার কথা বলা হচ্ছে এখন। শুরুও হয়েছে বেশ ঘটা করে। এই ব্যবস্থাপনায় উন্নয়ন ও পরিকল্পনা ব্যবস্থার কর্মকর্তাদের 'নিয়ন্ত্রকের' পরিবর্তে 'সহায়কের' ভূমিকা অর্জনের প্রয়োজন ও কার্যকারিতা সম্বন্ধে উপলব্ধি ও বিশ্বাস অর্জন খুবই আবশ্যক। এই বিষয়ে একজন প্রাক্তন বরিষ্ঠ আধিকারিকের (আই. এ. এস.) একান্ত আলাপচারিতায় তাঁর ব্যক্তিগত মতামত পেয়েছিলাম। তিনি বলতেন, আমাদের রাজ্যে একজন ব্যক্তিকেই একদিকে উন্নয়ন কর্মী, অন্যদিকে প্রশাসনের আধিকারিক এই দ্বৈত ভূমিকা পালন করতে হয়। একই ব্যক্তির মধ্যে স্বাভাবিক ভাবেই চলে উন্নয়ন সহায়কের মনোভাব ও ম্যাজিস্ট্রেসির দ্বন্দ্ব। স্বভাবতই এই দ্বান্দ্বিক পরিস্থিতির বিরূপ প্রভাব পড়ে উন্নয়ন ক্ষেত্রে। স্যারের এই মতামত কতটা প্রকট সত্য, যারা এই ব্যবস্থাপনার সঙ্গে রয়েছেন তারাই মর্মে মর্মে উপলব্ধি করতে পারবেন, এ আমার দৃঢ় বিশ্বাস। অবশ্য অন্যান্য আর পাঁচটা ক্ষেত্রের মতো এখানেও কিছু ব্যতিক্রমী মানুষ থাকেন যারা প্রকৃতই ভিন্ন ধাতু দিয়ে গড়া। নিজের কানে শোনা একজন অতিরিক্ত মুখ্য সচিব পর্যায়ের আধিকারিক একটি পর্যালোচনা সভায় বলছেন– আমাকে আমলা ভাববেন না। আমি আমলা নই, উন্নয়ন সহায়ক মনে করে কথা বলুন। অনেক বছর আগে সেই আধিকারিক মহাশয়কে দেখেছি, যখন একটি জেলার জেলা শাসকের পদে আছেন, তখন তিনি একটি অতি সাধারণ স্বাস্থ্যবিধান সংক্রান্ত আলোচনা সভায় তাঁর জন্য রাখা চেয়ারে না বসে মাটিতে পাতা চাটাইয়ে বসছেন। খুব অনুপ্রাণিত

হয়েছিলাম এই রকম একজন উচ্চ পদস্থ আধিকারিককে দেখে আমার কর্ম জীবনের শুরুতে। আর একজন যুগ্ম সচিব মহাশয়কে পেয়েছিলাম কল্যাণীর প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে। সালটা ২০০৩-০৪ হবে। পঞ্চায়েত জনপ্রতিনিধি ও কর্মচারীদের জন্য প্রশিক্ষকদের প্রশিক্ষণ চলছে। এই সময়ে গ্রাম পঞ্চায়েতের জন্য বেশ কিছু পরিবর্তন আনা হয়েছিলো আইন ও বিধিতে। যেমন একটি উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ছিল– চেক স্বাক্ষরকারী হিসাবে প্রধান ও উপপ্রধান এর জায়গায় প্রধান ও নির্বাহী সহায়ককে দায়িত্ব দেওয়া। এই যে উপপ্রধানের জায়গায় নির্বাহী সহায়ককে আনা হল নতুন নিয়মে, এর তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখেছিলাম ঐ প্রশিক্ষণ শিবিরে। বিশেষ করে জনপ্রতিনিধিদের মধ্যে থেকে এটা তাদের অপমান হিসাবেই ধরে নেওয়া হয়েছিলো।

অনেক ভালো মানুষ, যথাযথ মনোভাবের মানুষ, দেখেছি প্রশাসনে। পরিস্থিতির চাপে পড়ে তাদের কোনো কোনো সময় চূড়ান্ত বিরক্তি হতাশা ব্যক্ত করতেও দেখেছি। কিছু দিন আগে একজন আধিকারিক আফসোস করছিলেন, প্রথম জীবনের ইন্ডিয়ান স্ট্যাটিস্টিক্যাল ইন্সিটিউট এর চাকরি ছেড়ে এই পাবলিক সার্ভিসে জয়েন করার জন্য। তাঁর কথায় এ পাপের সার্ভিসে না এলেই ভালো হতো। তখন চাকরির জৌলুস দেখে চলে এলাম, এখন দেখছি কলঙ্কিত কালিমালিপ্ত পাপাচার। ভালো মানুষদের নিয়মনীতি মেনে নিজের মতো করে কাজ করতে না পারার বা যথেষ্ট পরিশ্রম ও দায়িত্ব পালনের পরও যখন প্রাপ্য মর্যাদা মেলেনা তখন হতাশা চেপে বসে হয়তো। আবার অন্যদিকে দেখলে দেখা যাবে এইসব ভালো পজিটিভ মনের মানুষরা না থাকলে সিস্টেমের মধ্যে সমতাই বা থাকে কী করে। সব দলেই ভালো খারাপের সংমিশ্রণ, সর্বস্তরেই। অন্ধকারের উৎস হতে উৎসারিত অলোই তো সবার জন্য ভালো।

এত সাতকাহনের সত্যিই কি কোনো প্রয়োজন আছে? আসলে প্রয়োজন নেই। কারণ উন্নয়নমুখী যেকোনো পরিকল্পনার রূপকার হলেন আর্থসামাজিক নেতৃত্ব অর্থাৎ ক্ষমতার ম্যানডেট প্রাপ্ত রাজনৈতিক কর্তৃত্ব। সেই নেতৃত্বের ভিশন, ইডিওলজি যদি বস্তুসম্মত না হয়, তখন প্রকল্প রচনা ও তার বাস্তবায়ন গোটাটায় হয়ে যায় জোড়াতালি। এই জোড়াতালির প্রকল্প কি আর্থসামাজিক উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় কোনো ভূমিকা রাখতে পারে? পারে না। তখন আর্থসমাজের দাবী, প্রশাসনের সরবরাহ আর নেতৃত্বের নিয়ন্ত্রণ বস্তুসম্মত সজ্জায় সজ্জিত হতে পারে না। এ চিৎকার করে ও ঠিক নয়, ও চিৎকার করে এ-র জন্যই যত গণ্ডগোল। আখেরে আর্থসামাজিক উন্নয়ন হাওয়ার গল্প ও কাগুজে দেখনদারি হয়ে নির্বাচনী ভোজের খাদ্য হয়।

বস্তুবাদী জীবনচর্চা প্রকৃত নেতৃত্বের জন্ম দেয়। সমকাল সমস্যা চিহ্নিত করে। সমাধানী গাইডলাইন দেয়। আর্থসামাজিক প্রকল্প রচনা মাটি ছুঁয়েই হয়। ইতিহাস তারই সাক্ষ্য। আমরা কি সেই জীবনচর্চার চার্চিক হতে প্রস্তুত? অন্যথায়, নান্যঃ পন্থা ।

নাটিকা

প্যারাডাইস

সুকৃতি

প্রথম দৃশ্য
(রমা ও তার মা দীপ্তিদেবী)

দীপ্তি— কি ব্যাপার! ওভাবে ঢাকছ কেন? কি হল ওখানে?

রমা— মানে, এই মা-নে কিছু না-মা।

দীপ্তি— কি হয়েছে? এগিয়ে এসো। (ডান হাতটা ধরে) এ-ব-বাবা কতটা ছড়ে গেছে? রক্তে মাখামাখি কাণ্ড! (দৌড়ে ঘরে গিয়ে First Aid Box নিয়ে ফিরে আসে, ডেটল দিয়ে ধুতে ধুতে) বল কীভাবে হল?

রমা— ঐ ক্লাসরুমে (আড়ষ্ঠ স্বরে)

দীপ্তি— কেন? (ঔষুধ লাগাতে লাগাতে)

রমা— ঠেলা ঠেলি করে ঢুকছিলাম, হোঁচট খেয়ে নিচে পড়ে যাই। ওঠার সময় বেঞ্চের বেরিয়ে থাকা পেরেকে।

দীপ্তি— থাক, হয়েছে। তো হুড়োহুড়িটার কী দরকার?

রমা— দ্বিতীয় বেঞ্চে বসবো বলে। (রমা জিভ কামড়ায়)

দীপ্তি— তাই! প্রথম বেঞ্চের জন্যও নয়! ওই বেঞ্চে বসে কি খেলা হয়? আম-জাম-কাঁঠাল লেখা কাগজ মেলানো... (রমা মুখ নিচু করে)। তোমার ব্যাগে কালকেই এসব ছাঁইপাশ কাগজ পেলাম। নতুন স্কুলে যাচ্ছ, একটু ভদ্রভাবে থেকো।
(রমার বাবা নরেশের ডাক, ঘর থেকে)

নরেশ— দীপ্তি তোমার জেরা ছাড়, আজ আমার ছুটির দিন, দাও এক কাপ কফি দাও তো।
(রমার প্রতি বিরক্তি ভরে দীপ্তির প্রস্থান রান্নাঘরে)

দ্বিতীয় দৃশ্য
(কয়েকদিন পর, সকালবেলা)

দীপ্তি— কই দেখি, দেখি তোর ব্যাগটা সব ঠিক আছে? রাতে যেভাবে রাখলাম সেভাবেই রেখে দিয়েছিস?

রমা— আমি এইটে পড়ি মা,– ওকি, তুমি ব্যাগ ঝেড়ে সব ফেললে কেন? ব্যাগটা তো আমি নিজে গুছাতে পারি, গুছিয়েছিলাম তো?

দীপ্তি— (বই খাতা গুণে গুণে, পড়ে পড়ে দেখতে থাকে) কবে থেকে শিখলে? একদিন class note book, কোনওদিন practical খাতা কোনওদিন আবার Drawing খাতা Missing তো তোমার হতেই থাকে।

দীপ্তি— ব্যস, (ব্যাগটা রেখে) আচ্ছা, এইটুকু বয়সে এত বিরক্তি কোত্থেকে আসে বলতো? এখন কিন্তু তুমি আর যে-সে স্কুলে পড়না রিমি, এটা মাথায় রেখো।

রমা— এত ভালো স্কুলে আনলে কেন? না আছে কোন গাছ.... খেলার মাঠটা পুরো ফাঁকা, রৌদ্রে এতটুকু বসার উপায় নেই।

দীপ্তি— Library room এ যাবি, বসবি।

রমা— মা তুমি তো দেখেছো আমাদের গ্রামের স্কুল মাঠটা কত্ত বড় ছিল...জামগাছের মগডালে উঠে, পিকলুদা ওর প্যাকাটে শরীর নিয়ে ঠিক উঠে যেত, নিমেষে টপাটপ করে জাম ফেলত— আমরা লুটোপুটি করে... শুধু মজা, আর খেলা....

দীপ্তি— হু, সেজন্যই তো তোমাকে এখানে আনা? ক্লাস তো আর হতো না, স্কুল সময়ের চারের তিন ভাগই টিফিন।

রমা— এটা কিন্তু উল্টোপাল্টা কথা।

দীপ্তি— ছাড় ও সব! এই দেখ, বোতল টিফিন বক্স, সমস্ত রেডি। দেখো, বোতলে কাউকে মুখ দিতে দিও না।

রমা— প্রতিদিন এক কথা বলো, ক্লান্ত হওনা?

দীপ্তি— খুব কথা বেড়েছে তোমার। (থালায় খাবার দিতে দিতে) তাড়াতাড়ি করো। খেয়ে নাও। চুল বাধতে এখনও বাকি, দশটা দশ তো বেজেই গেল।

রমা— মা, আজ থাকনা, চুলে শ্যাম্পু করেছি, একটা বেল্ট লাগালেই তো চোখে চুল আসবেনা।

দীপ্তি— বেশি বোকো না,

রমা— মাছ দিলে কেন? আমি পারবনা, এখন—

দীপ্তি— আমি বেছে দিচ্ছি, রিমি সোনা।

রমা— রিমি বোলোনা মা, দিদা আমার নাম রমা রেখেছিল, অমন পাল্টে ফেলছ কেন? রমাই ভালো লাগে শুনতে।

দীপ্তি— হ্যাঁ, সেই। তুমি তো অজ হয়েই থাকতে চাও। শোনো ভালো জায়গায়, ভালোভাবে পড়াশোনা করার জন্যই দিদাকে ছেড়ে এখানে আসা।

দীপ্তি— এসো দেখি, Pink colour এর গার্টারটা দিলাম, দেখতো কোন ক্লিপটা দেব?
(রিমি কথা বলে না)
কথা বলছো না , কেন? আচ্ছা এটিই বেশ লাগছে। না? (রিমি তবুও চুপ)

তৃতীয় দৃশ্য

(রমা সাইকেল নিয়ে বাইরে দাঁড়ায়, বন্ধুদের অপেক্ষায়)

রমা— পিউ, একি হেঁটে কেন?

পিউ— সাইকেলটা খারাপ।
(বুবাই-এর প্রবেশ)

বুবাই— চল, চলে যাব সব একসাথে, ওই তো অর্ক, সৌম ওরাও চলে এসেছে।

রমা— শোন না, বৃষ্টি হবে বলে মনে হচ্ছে, সবাই ছাতা নিয়ে হেঁটে যায়, আসার সময় মোমো খাবো।

অর্ক— মোমো টা ঠিক আছে। বাট, অলরেডি উই আর সো লেট। সো...

বুবাই— শোন না, রিমি, আজ চল অন্যদিন হবে...।

দীপ্তি— (দরজা থেকে উচ্চস্বরে) তোরা দাঁড়িয়ে কেন? সবাই আসেনি? দেরি হয়ে যাচ্ছে তো?

চতুর্থ দৃশ্য

(কিছুদিন পর, একদিন টিফিন আওয়ারে)

পিউ– রমা, টিফিনটা ফেলেদিলি?

রমা– কি করবো, তোরা কেউ না খেলে? না খেয়েছি জানলে, কি খেয়েছি, কোন খাবারে কতটা শরীর খারাপ ইত্যাদি সব মা চিন্তা করবে? তাছাড়া চপ-মুড়িটা খুব ভালো।
(সবাই হুটোপুটি করে খেতে থাকে)

১ম জন– এই, রমা পুজোয় এখানে থাকছিস তো!

রমা– না, না! অসম্ভব।

২য়– এবার আমরা দাদুর বাড়ি যাচ্ছি, ছোট্ট কাকু, পিসি-পিসেমশাই সব্বাই আমরা ঘুড়ি ওড়াবার প্ল্যান করছি।

৩য়– আমরা প্রতিটি মণ্ডপে ঘুরে ঘুরে পূজো দেখি। ফুচকা খাওয়া, বেলুন ফাটানো.....।
(রমা অন্যমনস্ক হয়ে পড়ে)

পঞ্চম দৃশ্য

(এদিন, রাত্রিবেলা)

রমা– বাবা, তুমি এত রাত করে ফেরো কেন?

নরেশ– অফিস তো আর কমদূরে না, রাস্তায় জ্যামও হয়ে যায় ।

রমা– পুজোর ছুটির কিছুদিন আগে থেকেই নাটকের রিহার্সাল শুরু হয়ে যায় গ্রামের স্কুলে। সন্তুদা এবারে রিহার্সালের দায়িত্বে আছে। ক্লাস এইটেরা এবারে অভিনয় করবে। ওরা বলেছিল, বাবা আমি যেতে চাই.. এসো না রেখে।

নরেশ– তাই নাকি? তবে তোমার মাকে না বলে তো হবে না। সকালে, আমরা এবিষয়ে কথা বলি? ঘুমিয়ে পড়, রাত হয়েছে।

রমা– আমার ভালো লাগে না বাবা এখানে, মাকে বলনা।

নরেশ– চুপ করো, তোমার মা শুনতে পেলেই গোল বাঁধাবে।

রমা– জানোতো বাবা, মেজকার মেয়ে টুনটুনি, ও এখন দিদার কাছে ঘুমায়, আমি এখানে আসার পর থেকে।

নরেশ– তোমার কি হিংসে হচ্ছে?

রমা– দিদা, মাথায় বিনি কাটত, অনেক কথা বলত, গল্প বলত, কখন ঘুমিয়ে পড়তাম।

নরেশ– যাচ্ছি তো, আমরা ছুটিতে–

রমা– ছুটিতে গেলে তো হবেনা। কি নাটক হবে, কি সাজতে হবে আমাকে, রিহার্সাল, নিজের পার্ট মুখস্থ কত সব ব্যাপার আছে।

দীপ্তি– (রান্নাঘর থেকে) কই গো, এসো খেয়ে নাও।

নরেশ– পরে কথা হবে। হ্যাঁ, (প্রস্থান), (রমা পাশ ফিরে শোয়)।

ষষ্ঠ দৃশ্য

দীপ্তি– তোমার খেয়াল আছে, সাড়ে নটা বাজছে? স্নান খাওয়া সব বাকি?

রমা– মা, ছবিটা এরকম হল।

দীপ্তি– কী করেছ? পাঁচ পাঁচটা একই ছবি? প্রথমটাই তো ভালো ছিল। প্রজাপতির ছবিটা ঠিকই আছে, পরপর ছবিগুলোয় যা দেখছি, গাছ ক্রমশ ফ্যাকাশে আর শীর্ণ হয়ে যাচ্ছে? এ-সব কী?

রমা– তাহলে, প্রথমটাই রাখি।
(দীপ্তি খপ করে ছবিটা রমার হাত থেকে নিয়ে ব্যাগ গুছোতে ব্যস্ত হয়ে পড়ে।)

দীপ্তি– যাও, স্নানে যাও চটপট কর। তোমার কোনও কাজেই আমি কোন ত্রুটি দেখতে চাই না, তাই আবারও আঁকতে বলেছিলাম–

সপ্তম দৃশ্য

দীপ্তি– শোন, তুমি কি পাগলামি শুরু করেছ? তোমার বাবা বলছিলেন, ১০দিন আগেই তোমাকে তোমার দিদা-কাকুর কাছে রেখে আসতে।

রমা– হ্যাঁ, মা আমিই বলেছিলাম।

দীপ্তি– এসব বাচ্চাছেলেমি ছাড়, বড় হচ্ছো তো। নাটক পরে আবার হবে। এখানে এটাই তোমার প্রথম বছর। আমি চাইনা তোমার Face loss হোক। Image টা ভালো রাখতে ভালো Result দরকার, Tuition এরও ছুটি পড়ছে না ছুটির এত আগে।

রমা– পরে আর কবে হবে?

দীপ্তি– হবে, হবে, খুব হবে। (রমার প্রস্থান, নরেশের প্রবেশ।)

নরেশ– ও, ওভাবে ছুটে গেল কেন?

দীপ্তি– ওর ব্যাপারটা আমাকেই বুঝতে দাও?

নরেশ– হ্যাঁ, বোঝ, তবে বেশি বুঝে, ওর মাথাটা বিগড়ে দিওনা।

অষ্টম দৃশ্য

(ইতিমধ্যে পূজো শেষ, Final পরীক্ষা শেষ)

দীপ্তি– শুনেছ, তোমার মেয়ে পারব না, পারব না করে কি কাণ্ডটাই না করেছিল। আমিও হাল ছেড়ে দিয়েছিলাম, যেমন পারছে তেমন পরীক্ষায় দিক। এখানেই থাক, অন্য কোথাও আর যাচ্ছিনা।

নরেশ– আসল কথায় এসো।

দীপ্তি– এভাবে বলো কেন? এই দেখো, দেখো, রিমি ২০ হাজার ছেলেমেয়ের মধ্যে ২০ Rank এ আছে।

নরেশ– ভালো।

দীপ্তি– ভালো কিগো? রিমি, রিমি কই তুমি!
(একটু পরে রমার প্রবেশ)

রমা– তনু পিসিদের ব্যালকনিতে দাবা শিখছিলাম।

দীপ্তি– তুমি ২০ Rank-এ আছো!

রমা– সত্যি নাকি? এই দেখনা, কাগজেই তো দেখাচ্ছে। মনে হচ্ছে, পাশ না করলেই তোর ভালো হত?

(রমা ঘরে যায়, পিছু পিছু দীপ্তি দেবীও)

দীপ্তি– একি বই মুছতে শুরু করলে, চল খাবে?

রমা– Final exam এর আর দরকার আছে?

দীপ্তি– Final Exam খুব ভালোভাবে দিতে হবে। অত দাবা খেলা শেখার দরকার নেই।

নবম দৃশ্য

(রেজাল্টের কয়েকদিন আগে, বিকেলবেলা)

রমা– মা, তাহলে, কালকেই যেতে হচ্ছে।

দীপ্তি– হ্যাঁ। Paradise আবাসিকে তোমাকে পাঠাবো না এমনটাই ভেবেছিলাম। তোমার দুর্দান্ত রেজাল্ট দেখে, ওখানকার কর্তৃপক্ষ কিছুতেই ছাড়তে চান না, তাছাড়া তোমার ভবিষ্যৎ কেরিয়ারের কথাও তো ভাবতে হবে।

রমা– কবিতা, সঙ্গীতা ওরা তো পড়াশোনায় আমারই মতো, সন্তুদা তো আমাদের থেকেও ভালো, তবু ওই স্কুলটাতেই দিব্যি আছে।

দীপ্তি– সামনে দিকে তাকাও, পেছন ফিরে দেখার কোন মানে হয়?

রমা– আবার একটা নতুন জায়গা?

দীপ্তি– ঠিক বলেছ, দেখবে ওখানে বন্ধুদের সাথে সারাক্ষণ থাকা, খাওয়া, আরও ভালো লাগবে। (হেসে) আমারও শাসন থাকবে না, নাকি বল?

দশম দৃশ্য

Paradise Hostel

(রমা ও চেতনার কথোপকথন)

রমা– আচ্ছা, তুমি যে এত অন্ধকারে বসে থাকো সারাক্ষণ, খারাপ লাগেনা? (চেতনা নীরব) শোন না, তোমার একা লাগেনা?

চেতনা– না, গো।

রমা– কেন? সবসময় দুটো বেডের মাঝখানে, এই সরু জায়গাটায় বসে এত কীই বা পড় কীই বা লেখ।

চেতনা– কি বোকা, বোকা কথা বলছ। পড়ার সময় একা মনে হয়না, খুব ভালো লাগে, লিখি অঙ্ক কষি উত্তর না মিললে, আবার...।

রমা– বাড়ির লোকেদের জন্য মন খারাপ করেনা?

চেতনা– করে, পাত্তা দিইনা।

রমা– যেদিন তুমি এখানে প্রথম এলে তোমার দাদা কিন্তু ওই দরজার পাল্লাটা ধরে খুব কাঁদছিল। আমি অবাক হলাম, তোমার চোখে একটুও জল নেই।

চেতনা– দাদা অমনি। আমাকে তো দাদা-মা আসতেই দিতে চাইনা এখানে। আমার ইচ্ছেতেই আমি এখানে।

রমা– অথচ, আমার ব্যাপারটা পুরো উল্টো।

চেতনা– আসলে, বাবা চাই আমি ডাক্তার হই। দাদাও BA, MA পাশ করে বেকার। বাড়ির অবস্থাটা ফেরাতে হলে এই সুযোগটা আমাকে নিতেই হত।

রমা– তুমি এমন করে ভাবো। তবে আমার ভয় করছে। এখনও আমার সব কিছু হতেই ইচ্ছে করে, কোনও নির্দিষ্ট করে কিছু বুঝতে পারি না। খেলার মাঝে পড়াটাও খেলা ছিল। রেফারেন্স বই দেখলে মনে হয়

বই থেকে দূরে থাকি। (চেতনা হাসে)

চেতনা— শোন, আমার মনে হয়, সবার খাওয়া হয়ে গেল, চল তাড়াতাড়ি কর।

একাদশ দৃশ্য

(কয়েকদিন পর)

চেতনা— না না থাক, সরতে হবেনা, শুয়ে আছ! শরীর খারাপ করছে?

রমা— না, ওই একটু।

চেতনা— একি প্রচণ্ড জ্বর তো! ম্যামকে জানাতে হবে।

রমা— দাঁড়াও, দাঁড়াও। এখন থাক, তুমি বরং ক্লাসে যাও।

চেতনা— না, আমি এ অবস্থায় তোমাকে রেখে যাবনা।

রমা— কেন? তোমার কাছে অনেকবার গেছি, কেমন তুমি অবহেলাভরে থাক, না তাকিয়েই কথা বল।

চেতনা— আচ্ছা ওসব থাক, একটু দাঁড়াও ম্যামকে ডাকি।

রমা— আহ, দাঁড়াও না একটুখানি, মাকে বলেছিলাম এখানে আমার ভালো লাগবেনা পড়াশোনাটা, মার রান্না করার মতো একটি কঠিন জিনিস মনে হয়।

চেতনা— রমা, রমা? জলপট্টিটা দিতেই হবে, এবারে।

রমা— এত জোরে চেচাচ্ছো কেন? আমি তো তোমার পাশেই আছি। এবারে পুজোয় কাকুর সাথে ঘুড়ি ওড়ানো, কাকির সুন্দর চুলগুলো নিয়ে বিনুনি করা, ফুচকা খাওয়া, স্কুলে নাটক কিছু মিস করব না, মাকে ডাকো তো, এবার কোন কথা শুনব না, যেতেই হবে আমাকে, টুনটুনিরা খুব মজা করছে।

চেতনা— নিশ্চয়ই বাড়াবাড়ি হতে যাচ্ছে, নাহ, ম্যামকে ডেকে আনি।
ম্যাম, ম্যাম।

দ্বাদশ দৃশ্য

১০ মিনিট পর

(চেতনা ও ম্যাম হন্তদন্ত হয়ে আসে)

সুপার ম্যাম—কই দেখি দেখি (কপালে হাত)। কই তেমন তো জ্বর নেই রে। হাঁ কর তো দেখি, চোখটা-সবই তো ঠিক আছে। পেটে লাগছে, রমা?

রমা— না, ম্যাম, আমার কিছু হয়নি

চেতনা— আমি দেখে গেলাম, খুব জ্বর ছিল, ভুল কথা বলছিল (আস্তে গলায়)।

ম্যাম— এখন কেমন বোধ করছ? রমা,

রমা— ঠিক আছি, শুধু মাথাটা ঝিমঝিম করছে। জ্বরটা আমার প্রায়ই আসে। ধরুন, দশদিনে চারদিন।

ম্যাম— কী বলিস? এত খেয়াল রাখি, সারাক্ষণ সবার, আচ্ছা তুই কেন জানাস না, তোর মাকে জানাতেই হবে? একটু পরেই আমি ওষুধ নিয়ে আসছি।

ত্রয়োদশ দৃশ্য

(রাত্রিবেলা)

চেতনা— একি রমা, সাড়ে নটা বাজছে, সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে তুমি ঘুমোওনি?

রমা— মশারিটা একটু খোলনা, কেমন দম বন্ধ হয়ে আসছে?

চেতনা– না, ম্যাম খুব বকবে।

রমা– ছাড় তো ম্যাম। তাহলে আমি মেঝেয় শোব?

চেতনা– না, দাঁড়াও ম্যাম এসে দেখে যাক তারপর খুলে দেব কেমন?

রমা– না, আমাকে বাইরে যেতে হবে, শুনতে পাচ্ছ দূর থেকে একটা সুন্দর সুর ভেসে আসছে।

চেতনা– আস্তে, পড়ে যাবে না হলে। আমি তো কিছু শুনছিনা।

রমা– কথা কম বলো, ধরোনা। (রমা সিড়ি দিয়ে দ্রুতগতিতে ছাদে উঠতে থাকে)। এখানেও তালাবন্ধ, কিছুতেই ভালোভাবে আওয়াজটা শুনতে পাচ্ছিনা, খোলা থাকলে তোমাকে বিশ্বাস করাতে পারতাম, কত সুন্দর সুর। (সিড়িতে বসতে গিয়ে রমা উল্টেপড়ে যায়)।

চেতনা– কী হলো? রমার মাথাটা কোলে নিয়ে, চোখ তুলে তাকাও? একি হলো, নিশ্চয় বড় বিপদ। ম্যাম, ম্যাম।
সুপার ম্যামের প্রবেশ

ম্যাম– একি তোরা এখানে কেন? এই অবস্থা কী করে?

চেতনা– আসলে ম্যাম....

ম্যাম– থাক, দেখি দেখি, সোজা কর, বাম হতাটা ধর।
(অ্যাম্বুলেন্সের আওয়াজ)

চতুর্দশ দৃশ্য

(কেবিনে, রমা, ডাক্তার ও রমার বাবা নরেশ)

রমা– ডাক্তারবাবু দেখুন, কেমন ঘুটঘুটে অন্ধকার, গায়ের লোম একটু খাড়া হয়ে যাচ্ছে ঠিকই, তবু সাহস পাচ্ছি, ঐ একটু আলো দেখা যাচ্ছে, না, আলো তো নেই..... লাইট অন্ অন্? একি জ্বলছে না কেন?

ডা. বাবু– কীসের আলো?

রমা– আসলে নাটক হচ্ছে তো? লাইটম্যান ঠিকঠাক নিজের কাজটাও করতে পারছেনা।

নরেশ– (কান্নায় ফেটে পড়ে) মা, রমা, তুমি কী বলছ মা? ডা. বাবু রমার কী হয়েছে? তবে কী?

ডা.বাবু– চুপ করুন, একটু শান্ত হোন, নার্স, পেশেন্ট কে দেখে রাখো, ২মিনিট বাদে আসছি।
আসুন বাইরে আসুন।

পঞ্চদশ দৃশ্য

(কেবিনের বাইরে দীপ্তি, নরেশ ও ডাক্তারবাবু)

ডা.বাবু– আপনাদেরকে ধৈর্য্য ধরতে হবে, একটা বড় বিপদের হাত থেকে আপনারা বেঁচেছেন।

দীপ্তি– ওর এমনটা কেন হল ডা. বাবু। শুধু জ্বরের কথাই শুনেছিলাম, আগে কখনও কোন শারীরিক সমস্যা ওর দেখিনি। (দীপ্তির চোখে অনবরত জল গড়াচ্ছে)

ডা.বাবু– এটা মানসিক সমস্যা। ওর ইচ্ছেগুলোকে গুরুত্ব দিন। ওর অত্যন্ত নরম মন। একটু শুধু বাঁধন খুঁলে দিন, কোন সমস্যা হবে না। জ্ঞান ফেরার পর থেকে ওর থেকে যে কথাগুলো স্পষ্ট শোনা গেছে, তার মর্মার্থ এই যে, ওর বলা কথা চাপা পড়ে যাচ্ছে, ওর পছন্দ, আপনাদের পছন্দে ঢাকা পড়ছে।

নরেশ– ও যে, খুব ভুল বকছিল ডাক্তারবাবু, কি থেকে কি হয়ে গেল?

ডা.বাবু– ভরসা রাখুন। আমাদের প্রতি। দুদিন পরেই ওকে নিয়ে যান। ও যেখানে থাকতে চায়, যাদের সঙ্গে

ভালো লাগে, সেখানে নিয়ে যান। ওর ভুল বলা কথার কিছুই মনে থাকবেনা, বা এই পরিস্থিতিও এমনিতেই ভুলে যাবে।

ষষ্ঠদশ দৃশ্য

(দুদিন পরে, বিকেলবেলা)

রমা– মা এত সব জামাকাপড় গুছোচ্ছ কেন?

দীপ্তি– তোমার দিদার বাড়ি যাচ্ছি।

রমা– তো বইগুলো যে টেবিলেই রেখে দিলে?

দীপ্তি– ওগুলো নেব না।

রমা– আচ্ছা, কদিন থাকবো ওখানে।

দীপ্তি– ওখানেই থাকব আমরা, আর ফিরবো না, ওই স্কুলে যে বই পাবে, তাতেই হবে।

নরেশ– এবারে, টুনটুনির স্থান আর নেই রমার দিদার কাছে, নাকি রমা? (সবাই হাসতে থাকে)। আর নাটক তো হচ্ছেই।

রমা– (আনন্দে লাফিয়ে উঠে) বল কী?
(নরেশ ও দীপ্তি মাথা নাড়ায়)

গল্প

অপেক্ষা

তানিয়া খাতুন

বাড়িটি বেশ পুরোনো। ঘরগুলো উঁচু উঁচু। দীর্ঘ বারান্দা। কুয়োতলা, চিলেকোঠার ঘর, আর কালচে ছাদ, ছাদের বেশিরভাগ ইঁটগুলোর ফাঁক ফোকর থেকে বের হয়েছে কিছু সদ্য অঙ্কুরিত চারাগাছ। অনুরাধাদেবী ঐ চারাগাছগুলোর সাথে কথা বলেন, সন্তান স্নেহে তাদের কচি পাতায় হাত বুলোতে থাকেন। এ বাড়িতে ফুলগাছ, বাগান কোনোকিছুরই অভাব নেই। তবু অনুরাধা দেবী ঐ কংক্রিটের মধ্য থেকে বের হয়ে আসা গাছগুলোকে বেশি স্নেহ করেন, নিজের সাথে একাত্ম করতে পারেন। অনুরাধাদেবীর পরিচয়,—উনি দালানবাড়ির মালকিন। উচ্চ শিক্ষিতা, বয়স চল্লিশ পেরিয়েছে, নিঃসন্তান, বিধবা। প্রায় কুড়ি বছর আগে অনুরাধাদেবীর বাবা নিরুদ্দেশ হয়েছিলেন। অনেকের ধারণা তিনি আর বেঁচে নেই। সেই শোকে প্রায় দুই বছর পর উনার মা মারা যায়। চার ভাইবোনের সবার বড় অনুরাধাদেবী। মাত্র বাইশ বছর বয়সে তিনি ভাইবোনের প্রতি দায়িত্ববোধ অনুরাধাদেবীকে মা এর আসনে বসায়। ঐ তিন ভাইবোনের মধ্যেই তিনি নিজেকে খুঁজে পেয়েছেন বরাবর, পেয়েছেন পূর্ণতা। বাড়ির আয়-ব্যয়ের হিসেব নায়েব মশায় রাখতেন, মাসের শেষে যে টাকাটা অনুরাধাদেবীর হাতে তুলে দিতেন তাতে দিব্যি সুন্দর চলে যেত। এভাবেই ভাইবোনগুলো বড় হলো, বিয়ে হলো, যে যার কর্মস্থলে গিয়ে সংসার বাঁধল। অনুরাধাদেবী একা হয়ে পড়লেন। বছর পাঁচেক আগে ভাইবোনদের উদ্যোগে অনুরাধাদেবী বিয়ের পিঁড়িতে বিধবা হন। সেরিব্রাল অ্যাটাকে মারা গিয়েছিলো বর। চল্লিশের অনুরাধা সেদিনের কথা মনে করে আজও চোখের জল ঝরান।

আজ এই মুহূর্তে অনুরাধাদেবী ছাদে দাঁড়িয়ে আছেন। সদ্য স্নান করে ভেজা চুলে তিনি যেন সাক্ষাৎ সাদা কাপড়ে দুর্গা প্রতিমা। এক পা দু পা করতে করতে তিনি চিলেকোঠার ঘরটিতে ঢুকলেন, এ ঘরে ঢুকলেই অদ্ভুত রকমের বিষণ্নতা তাকে ঘিরে ধরে। দরজা জানালা বন্ধ করে আলো জাললেন। ঘরটি বেশ বড়। একদিকে খাট আর একটি পুরোনো আলমারি ছাড়া কিছুই নেই। আজ থেকে পাঁচ বছর আগে এই ঘরটি ফুল দিয়ে সাজানো হয়েছিল। এই খাটে তার বউ সেজে চুপটি করে বসে আপন মানুষটার জন্য অপেক্ষা করার কথা ছিল। কিন্তু সে অপেক্ষা করার সৌভাগ্যটুকু তার কপালে সইলো না। অনুরাধাদেবী আস্তে আস্তে আলমারিটির দিকে এগিয়ে গেলেন। লাল বেনারসিটি বের করে সারা শরীরে জড়িয়ে ফেললেন, গয়নাগুলো একটা একটা করে পরতে শুরু করলেন। তারপর কিছুক্ষণ খাটে বসে থাকলেন। এ গোপন কাজটি তিনি প্রায়ই করেন।

দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ পাওয়া গেল।

—কর্তামা, কর্তামা, ঘরে আছেন?

—কিছু বলছিস শিবু?

—মা, ছোটোদিদাই ফোন করেছে।

—তাকে বল, আমি কিছুক্ষণ পর ফোন করছি।

—আচ্ছা, মা।

অদিতি। অনুরাধাদেবীর ভাইয়ের মেয়ে। এবার H. S দেবে। টুক কথাতেই সে তার মাসিমণিকে ফোন করে। মেয়েটা অনুরাধাদেবীর একদম নেওটা হয়েছে। অনুরাধাদেবী শাড়ি-গয়না গুটিয়ে রেখে নিচে নেমে এলেন।

—হ্যালো, অদিতি,

—মাসিমণি, তোমার জন্য সারপ্রাইজ আছে।

—কী সারপ্রাইজ?

—আমি আসছি তোমার কাছে, পরীক্ষার আগের এই দুই মাস আমি তোমার কাছেই থাকবো।

—আচ্ছা, থাকিস। কিন্তু পড়াশোনায় একদম ফাঁকি

দেওয়া যাবে না।
—এ বাবা, তোমাকে তো বলেই দিলাম। সারপ্রাইজ হল কই?
—পাগল মেয়ে!
—শোনো না, তোমাদের ওখানে ফিজিক্সের কোনো টিচার আছে গো? থাকলে ভালো হত। ফিজিক্সটা আমার যা-তা অবস্থা।
—আচ্ছা তুই আয়, আমি দেখছি।
শিবুকে দিয়ে সত্যেন মাষ্টারমশাইকে অনুরাধাদেবী ডেকে পাঠিয়েছিলেন। আজ বিকেলে উনার আসার কথা। কিছুক্ষণ আগে শিবু এসে বলে গেল, মাষ্টারমশাই এসেছেন। অনুরাধাদেবী নিচে বসার ঘরে উনার সঙ্গে কথা বলতে বসলেন।
—নমস্কার। আমি অনুরাধা চৌধুরী।
—নমস্কার। আপনাকে এখানে সবাই চেনে। আমিও তার ব্যতিক্রম নই।
—আপনারও অনেক সুনাম রয়েছে। সেই সুবাদে আমিও আপনার অনেক নাম শুনেছি। অদিতি, আমার ভাইঝি। এই দুমাস ওকে একটু সময় দিতে হবে।
—ঠিক আছে। আমি সপ্তাহে দুদিন আসব। ভাইঝিকে বলবেন। আচ্ছা, এখন আমি উঠি।
—সে কি। উঠবেন কী? দাঁড়ান, শিবুকে বলি একটু চা দিয়ে যেতে।
—না আজ থাক।
মাষ্টারমশাই দ্রুত ঘর থেকে বের হয়ে গেলেন। অনুরাধা ওখানেই বসে রয়েছে। পঞ্চাশ ছুঁই ছুঁই এই মাষ্টারমশায়ের কন্ঠ অসম্ভব দৃঢ় দীপ্ত বলিষ্ঠ। ফিজিক্সের থিওরিগুলো উনার কন্ঠে নির্ঘাত জীবনানন্দের কবিতা হয়ে উঠবে।
পাঁচদিন পর অদিতি আসল। দুপুরবেলা মাসির সাথে জমিয়ে গল্প করল। বিকেলে মাষ্টারমশায়ের পড়াতে আসার কথা। শরীরটা খুব খারাপ থাকায় বিকেলের দিকে অনুরাধাদেবী ঘুমিয়েছিলেন, সন্ধ্যার দিকে ঘুম ভাঙল।
—শিবু, শিবু।
—কর্তা মা ডাকছেন?
—অদিতিকে পড়াতে এসেছে?
—হ্যাঁ কর্তা মা।
—উনাকে কিছু খেতে দিয়েছিস?
—না কর্তা মা।
—এ কি, এতক্ষণ হয়ে গেল মানুষটাকে কিছু দিসনি।
—এক্ষুনি দিচ্ছি।
—থাক, আমি চা করছি। তুই গিয়ে দিয়ে আয়।
অনুরাধাদেবী খুব যত্নের সাথে দুকাপ চা বানালেন। শিবুকে দিয়ে মাষ্টারমশায়ের জন্য চা পাঠিয়ে নিজে খেতে বসলেন। চা টা খেতে খেতে হঠাৎ মনে হলো, শিবু তো চায়ের কাপ নিয়ে চিলে কোঠার ঘরের দিকে গেল। তবে কী? চিলেকোঠার ঘরে মাস্টারমশাই অদিতিকে পড়াচ্ছেন? অসম্ভব! এটা হতে দেওয়া যায় না। অনুরাধাদেবী চায়ের কাপটি টেবিলে রেখে দ্রুত পায়ে সিঁড়ি দিয়ে উঠতে শুরু করল।
ঘরে ঢোকার আগে অনুরাধাদেবীর কানে ভেসে এলো —
—বাহ্ শিবু তুমি তো খুব সুন্দর চা বানাও।
—আজ্ঞে চা তো কর্তামা বানিয়েছেন।
—তাহলে তোমার কর্তা মা সুন্দর চা বানান।
অনুরাধাদেবী ছোটোবেলা থেকেই নিজের কিছু মেয়েলি গুণ, যেমন—সেলাই, রান্না ইত্যাদির প্রশংসা শুনে বড় হয়েছেন। তাই নিজের প্রশংসা শুনতে তার আর ভালো লাগল না। তবে আজ হঠাৎ মাস্টারমশাই এর মুখের এই সামান্য প্রশংসাতেই তিনি যেন মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে গেলেন। কিছুক্ষণ আগের সমস্ত রাগ এক নিমিষেই হারিয়ে গেল। ঘরে না ঢুকেই তিনি সেখান থেকে ফিরে এলেন।
অদিতির রিকোয়েস্টে মাস্টারমশাই সপ্তাহে তিন দিন করে পড়াতে আসতে শুরু করলেন। অনুরাধাদেবী আড়াল থেকেই উনার আসার প্রতীক্ষায় থাকেন। নিজেকে পরিপাটি করে রাখেন, যদিও মাস্টারমশাই এর সামনে কখনই যাননা। শুধু শিবুর হাত দিয়ে উনাকে ঘনঘন চা করে পাঠান।
উনার সম্পর্কে জানার আগ্রহে অনুরাধাদেবী একদিন অদিতিকে জিজ্ঞেস করল—
—স্যার কেমন পড়াচ্ছেন?
—ভালো গো মাসিমণি। শুধু আমার এই মোটা মাথাতে

ঢুকতে চায় না এই যা।
—তাহলে হবে কীভাবে? ভালো বোঝায় না নাকি?
—স্যার খুব সুন্দর করে কথা বলেন। গুছিয়ে বোঝানও খুব সুন্দর করে। কিন্তু পরীক্ষার এই কদিন আগে আমি আর নিতে পারছিনা।
—তোদের সিলেবাসে Theory of relativity বলে তত্ত্ব আছে?
—আছে, অল্প। কিন্তু কেন?
—জানতে ইচ্ছে হয়। বুঝিয়ে দিবি?
—না বাবা। বোঝানো আমার দ্বারা হবে না। এসব অনেক শক্ত জিনিস।
—আচ্ছা বেশ।
দুদিন বাদে অদিতির জন্মদিন। সেই উপলক্ষ্যে ওর মা বাবা এসেছে। বাড়িতে খুশির হাওয়া বইছে, সবাই একসাথে, একজনের কথা শেষ হতে না হতেই আরেক জনের কথা শুরু হয়ে যায়। রান্নাঘর থেকে অনুরাধাদেবী ওদের এই বকম বকম শুনতে শুনতে রান্না করে যান। বাড়িটি যেন প্রাণ ফিরে পেয়েছে। অনুরাধাদেবী অনেকগুলো পদ রান্না করলেন। আজ, অদিতির জন্মদিন উপলক্ষ্যে মাস্টারমশাইকে ডাকা হয়েছে। অনুরাধাদেবী নিজে খাবার পরিবেশন করেন। মাস্টারমশাই তৃপ্তির সঙ্গে খাবার খেলেন। মাস্টারমশাই খাওয়া শেষ হলে অনুরাধাদেবী মনে মনে খুব আনন্দ অনুভব করলেন। এ অনুভূতি তার নিজস্ব, একান্ত।
—স্যার, আপনি আজকে একটু পড়াতে পারবেন?
—জন্মদিনে পড়তে চাইছো? বাহ্
—না, আমি না। আপনি আমার মাসিমণিকে পড়াবেন। Theory of relativity টা বুঝিয়ে দেবেন।
—অবশ্যই দেবো। ডাকো মাসিকে।
অনুরাধাদেবী এসব শুনতে পেয়ে লজ্জায় ছাদে গিয়ে হাজির। অদিতিটার কোনো কাণ্ডজ্ঞান নেই। এই বুড়ো বয়সে কী আর ওভাবে পড়তে বসা যায়।
—অনুরাধাদেবী।
—(অনুরাধাদেবী হক চকিয়ে গেলেন) মাস্টারমশাই আপনি।
—শুনলাম আপনি আপেক্ষিকতাতত্ত্ব বুঝতে চান?
—ওই আর কী। অদিতির কাছে জানতে চেয়েছিলাম।
—বাহ! আমি তো আপনার মতো স্টুডেন্টই চাই। যার নিজের থেকে জানার আগ্রহ থাকবে।
—(অনুরাধাদেবী লজ্জায় কিছুটা গুটিয়ে যায়, আস্তে আস্তে শাড়ির আঁচলটা ঘাড়ে টেনে নেয়) কী যে বলেন। আমি আর কোথাকার কে। স্বয়ং রবি ঠাকুরই এ তত্ত্ব বুঝতে পারেননি।
—তাই নাকি? এ তথ্য তো আমার কাছে নেই। তবে আমি যতদূর জানি, ধর্ম ও বিজ্ঞান বিষয়ক কোনো সম্মেলনে উনাদের দেখা হওয়ায়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এ তত্ত্বের প্রয়োগ নিয়ে জানতে চেয়েছিলেন।
—ও আচ্ছা, তাহলে আমি ভুল জানি।
—ওটা কোনো ব্যাপার না। এরকম অনেক কথায় প্রচলিত থাকে যার সত্য-মিথ্যা বিশ্লেষণ ছাড়াই আমরা বিশ্বাস করতে ভালোবাসি। চলুন, ছাদের ঐদিকটায় একটু হেঁটে আসি। (ওরা একসাথে হাঁটতে শুরু করে)।
—আপনি মিষ্টিটা খেলেন না কেন?
—ভালোবাসিনা তাই।
—আচ্ছা।
—জানেন, একবার আইনস্টাইন চার্লি চ্যাপলিনকে বলেছিলেন, 'আপনার খ্যাতি বেশি মূল্যবান, কারণ আপনি মুখে কিছু না বললেও দর্শক সব বুঝে যায়।' উত্তরে চার্লি চ্যাপলিন বলেছিলেন, 'আপনার খ্যাতি আরও বেশি মূল্যবান কারণ মানুষ কিছু না বুঝে আপনাকে ভালোবাসে।'
—আপনি কথা বলেন গল্পের মতো করে। শুনতে ভালোলাগে।
(এর মধ্যে শিবু এসে জানান দিয়ে গেল ছোটদি ভাই ডাকছে)
—চলুন নীচে যাওয়া যাক।
—হ্যাঁ, সন্ধ্যে হয়ে এসেছে। অনেকটা সময় ছাদে আছি বুঝতেই পারিনি।
—এটাই তো Theory of relativity আপেক্ষিকতার তত্ত্ব। সময় আপেক্ষিক। নির্দিষ্ট সূচকের সাপেক্ষে সময় কাজ করে।
আপনি নিশ্চয় আমার সঙ্গ পছন্দ করেছেন, তাই সময়টা কীভাবে কেটে গেল বুঝতেও পারেননি। আমি

যদি আপনার অপছন্দের মানুষ হতাম তাহলে সময়টা কাটতেই চাইতো না।

—এত সুন্দর ভাবে ফিজিক্স আর মন একসাথে করা যায় অনুরাধাদেবীর জানা ছিল না। কোনো উত্তর না দিয়ে ওরা চুপচাপ সিড়ি বেয়ে নীচে নেমে এলো।

নীচে নেমে আসতেই অদিতি বলে উঠল—

—মাসিমণি, আমি মা বাবার সাথে বাড়ি যাচ্ছি, এক্সাম শেষে তোমার কাছে আসব।

—কিন্তু তুই যে বলেছিলি দুমাস থাকবি?

—দেখ না, মা-বাবা ছাড়ছে না। সরি গো।

—আজই চলে যাবি?

—হ্যাঁ, এই একটু পরেই।

—আচ্ছা।

অদিতি তার স্যারের কাছে এগিয়ে গিয়ে বলল—স্যার, আমি এক্সাম দিয়ে আপনাকে জানাব।

—আচ্ছা, ভালোভাবে পরীক্ষা দাও।

রাতের মধ্যে সবাই একে একে চলে গেল। অনুরাধাদেবী একা ছিলেন আবার একাই থেকে গেলেন। কাল থেকে সে আর পরিপাটি হয়ে বিকেলে একজনের প্রতীক্ষায় থাকবে না। ঘন ঘন চা করবে না। আজ অনেকদিন পর অনুরাধাদেবী চিলেকোঠার ঘরে ঢুকল, দরজা জানালা খোলা রেখেই নিজেকে লাল বেনারসী আর গহনাতে সাজিয়ে তুলল। চাঁদের আলোতে সে যেন সদ্য ফোঁটা পদ্ম ফুল। না, সে আজ চুপটি করে খাটে বসে থাকেনি। ঘর থেকে বেরিয়ে এসে বাইরের প্রকৃতিকে জানান দিলো তার অস্তিত্ব। সে ছাদের রেলিং ধরে হাঁটতে হাঁটতে হাতে বাঁধলো ইঁটের ফাঁক থেকে বেরিয়ে আসা সেই ছোট্ট চারাগাছটা। মাঝের কিছুদিন সে অনুরাধাদেবীর অগোচরেই বেড়ে উঠেছে, অনুরাধাদেবী ভুলেই গিয়েছিল ছোট্ট এই প্রাণটির কথা। তবু কেমন অভিমান নিয়ে দাঁড়িয়ে থেকে নিজের অস্তিত্বের জানান দিচ্ছে। অনুরাধাদেবী গাছটির নেতিয়ে পড়া পাতায় হাত রাখল, মনে মনে চিৎকার করে বলল—বাবা, তুমি কেন আমাদের ফেলে গেছিলে? ফিরে এসো, ফিরে এসো। অনুরাধাদেবীর চোখের জল গাছটির গায়ে গড়িয়ে পড়ল। এই গাছটিই একমাত্র অনুরাধাদেবীর অপেক্ষায় ছিল। ভালোবাসার অপেক্ষা তাকেও করতে হবে।

কনে দেখা

বরুণ শ্যেন

রুপমারীর খুনা রবি পড়াশোনায় ভালো না হলেও বর্তমান সরকারের অনুগ্রহে পাঁচ লাখ দিয়ে পৌরসভায় ক্ল্যারিকাল পোস্টে একটা চাকরি জুটিয়েছে তিন বছর আগে। সেই রবি গত দু' বছর থেকে মেয়ে দেখছে বিয়ে করবে বলে। এ পর্যন্ত পঁচিশ ত্রিশটা মেয়ে দেখলেও সে যেমন মেয়ে চাইছে তা আর মিলছে না। মাঝে মাঝেই কোনো কোনো বন্ধু তাকে টিটকিরি মারে, 'ভাগ্যিস ঘুস দিয়ে কোনো মতে একটা চাকরি জোগাড় করেছিলিস! না হলে যে কী করতিস!'

রবির এসবে এখন কান সয়ে গেছে। সে এখন একটা কথায় ভাবে। সে দেখতে খারাপ বলেই ভালো মেয়েকে বিয়ে করবে। পরবর্তী প্রজন্ম ভালো হওয়া চায়।

সে উদ্দেশ্যেই রবি নানা ঘটককে একটা ভালো মেয়ে দেখার জন্যে বলেছে। মেয়ে কেমন হওয়া চায় তারও পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা দিয়ে রেখেছে। আর ঘটকরাও এই রকম একটা সামাজিক কাজে অংশ নিতে আর দুটো উপার্জনের জন্য সব ক্যাটাগরির ছেলেদের জন্য মেয়ে এবং সব ক্যাটাগরির মেয়েদের জন্য ছেলে খুঁজে দেয়।

এই রকম ঘটকদেরই একজন এসেছে রবির কাছে কিছু মেয়ের ছবি নিয়ে। ঘটক মোবাইলে একটি মেয়ের ছবি দেখিয়ে বললেন, মেয়েটি এবার সেকেন্ড ইয়ারে উঠলো। বাবার অবস্থাও ভালো, বাবা রেলে চাকরি করে। ভালোই দেবে। রবি নাকি সুরে একটু টেনে বলল, কিন্তু...!

রবি নাকটা একটু বোঁচা হওয়ায় তার সব কথায় একটু অস্পষ্ট শোনায়। প্রথম প্রথম যারা শোনে তারা 'কী বললেন' বলে আবার শুনতে চায়। বার কয়েক রিপিট শোনার পর সে কী বলছে তা বোধগম্য হয়। ঘটকের প্রথম প্রথম এমনটাই হতো। এখন বুঝতে খুব একটা অসুবিধা হয় না। ঘটক বললেন, আবার কিন্তু কিসের ! নাম করা বংশ। মেয়েও খুব একটা খারাপ নয়। আপনার সঙ্গে ভালো মানাবে।

রবি বিরক্তি সহকারে বলে, ধুর! কী সব মেয়ে দেখাচ্ছেন, কালো একটা মেয়ে, আর আপনি বলছেন 'খুব একটা খারাপ না'!

রবির বন্ধু গণেশ তার স্থুল শরীর দুলিয়ে একটা বিশ্রী হাসি দেয়। এ হাসিতে রবির পিত্তি জ্বলে যায়, দাঁত খিঁচিয়ে বলে, কেলাচ্ছিস কেন?

'তোর সঙ্গে হেব্বি মানাবে'--- গণেশ আবার খ্যাঁক খ্যাঁক করে হেসে ওঠে। নিজের হাসি কন্ট্রোল করতে না পেরে গণেশ পাশের তেলে ভাঁজার দোকানে উঠে যায়।

রবি ঘটককে বলে, আমি তো আপনাকে আগেই বলেছি, মেয়ে আর তার পরিবার দুটো ভালো হলে আর কিছু চাই না। আর কি ছবি আছে...

ঘটক তার অ্যান্ড্রয়েড সেট থেকে একটা একটা করে ছবি দেখাতে থাকে। বেশ কয়েকটি ছবি দেখার পর রবি একটি ছবি নির্বাচন করে বলে এটা সম্পর্কে একটু বলুন।

ঘটক একটু মুচকি হেঁসে বলে, 'আর কি বলবো, সবই ঠিক আছে, কিন্তু আপনি যে বলেছিলেন বি.এ পড়া বা পাস করা মেয়ে নেবেন, মেয়েটি এবার ইলেভেনে উঠেছে।'

রবি একটা ভাব নিয়ে বলে, হুঁ, সেটাই তো।

গণেশ পাশের দোকান থেকে ইতিমধ্যে কয়েকটা গরম গরম শিঙাড়া নিয়ে এসে দাড়িয়ে দাঁড়িয়ে খাচ্ছিল, একটা মুচকি হাসি দিয়ে বলে, 'শালা দু' বছর ধরে মেয়ে দেখছিস, যাদেরকে তুই বয়স কম বলে রিজেক্ট করে দিয়েছিলিস তারা এখন সব বি. এ পড়ছে। এ ভাবে আর কয়েক বছর পেরিয়ে গেলে এটাই তখন বি.এ পড়বে। অত ভেবে লাভ নেই একটু বয়স কম হলেও মেয়েটা দেখতে খাসা আছে, চল দেখে আসি।'

ঘটক তার ঝুলি থেকে সব ঝেড়ে মুছে বের করে দিলে দুটো মেয়ে পছন্দ হয় রবির। রবি বন্ধু গণেশকে

জিজ্ঞেস করে, এই দুটো মেয়ে কে দেখা যায়, কী বলিস?

গণেশ বলে, 'তুই যা চাইছিস সবই তো মিলে যাচ্ছে, তাহলে এখন প্রাকটিক্যালি দেখে এলেই হয়। 'ঘটকের চেহারায় খুশির ভাব, বলে, তাহলে কবে যাচ্ছেন....

রবি বলে, 'সামনে রবিবার একটা, পরের রবিবার আরেকটা'।

'ঠিক আছে, কোনটা আগে যাচ্ছি ফোন করে জানাবো' বলে ঘটক বিদেয় নেয়।

রবিবার রবি, গণেশ আর রবির আর এক বন্ধু মৃদুল একটা বাইকে রওনা দেয়। দুপুর একটা নাগাদ মেয়ের বাড়ি পৌঁছালে মেয়ের বাবা আর আগে থেকেই উপস্থিত ঘটক তাদের আপ্যায়ন করে নিয়ে গিয়ে তাদের যথাস্থানে বসায়। এটাই নিয়ম মেয়ে দেখানোর।

একটু পর মেয়ে দেখানোর পালা শুরু হবে, তার আগে খাওয়া দাওয়ার পাট চুকিয়ে নেওয়াটাও নিয়ম। তাই একে একে চারটি থালা বোঝায় ফলফলারি মিষ্টি ডিম নিয়ে হাজির মেয়ের দাদা। মেয়ের বাবা বসে বসে সব তদারকি করতে থাকে। খাওয়া দাওয়া হয়ে গেলে ঘটক বলে, এবার মেয়ে নিয়ে আসুন।

ঘটক এমন ভাবে বলে যেন খাবারের শেষ পদ নিয়ে আসতে বলে। একটি সুশ্রী উজ্জ্বল একটু বেঁটে খাট মেয়ে তাদেরই সামনে রাখা চেয়ারে এসে বসলো। বসলো ঠিক নয় তার মাসি তাকে নিয়ে এসে বসালো। চোখ তার মাটির দিকে নিবদ্ধ।

ঘটক রবি ও তার বন্ধুদের উদ্দেশ্যে বলে, এবার মেয়ের কাছ থেকে যা জানার জেনে নিন।

গণেশ একে একে মেয়ের নাম, বাবার নাম, মেয়ের পড়াশোনা কত দূর, মাধ্যমিকে/ উচ্চ মাধ্যমিকে কত পেয়েছে, রান্নাবান্না জানে কিনা সব জানতে থাকে।

মেয়েটি চোখ তুলে খুব শান্ত ভাবে সব প্রশ্নের উত্তর দিতে থাকে। মৃদুল আর ঘটক মাঝে মাঝে সঙ্গত দিলেও রবি নীরবে পর্যবেক্ষণ করতে থাকে। প্রায় আধ ঘন্টা ধরে এই প্রশ্নোত্তর চলতে থাকে। তারপর যখন মোটামুটি সব জানা শেষ তখন নিয়ম মত মেয়েটির হাতে পাঁচশো টাকা দিতে দেয় রবি।

ওখান থেকে বেরিয়ে বাইকে যেতে যেতে মেয়েটিকে নিয়ে আলোচনা হতে থাকে।গণেশ ও মৃদুল এই মেয়েটিকেই বিয়ে করার কথা বলে। রবি বলে, সব কিছুই ঠিক আছে, হাইট টাতেই মার খেয়ে যাচ্ছে। তার নিজের হাইট কম আবার মেয়ের হাইটও কম। তবে মেয়েটিকে তার ভালো লেগেছে।

গণেশ ও মৃদুলের কথা শুনে রবি অবশেষে বললো যে, ঘটক আর একটা মেয়ে দেখাতে চেয়েছে ওটা দেখা হলে একটা ডিসিশানে পৌঁছাবে। তার ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে গেছে। এই দুটো মেয়ের মধ্যেই একটাকে সিলেক্ট করবে।

ইতিমধ্যে অন্য মেয়েটিকেও দেখে এসেছে, কারোরই পছন্দ হয়নি। মৃদুল বলে, দ্বিতীয় অপশান তো ক্যানসেল, এবার কী করবি?

ওই মেয়েটিকেই বিয়ে করে নে।

গণেশ বলে, ওই মেয়েটাই ঝাক্কাস আছে, ঘটককে ফোন কর।

রবিরও মন টানছে। হাইট একটু কম ছাড়া আর সব পরিপাটি। সে ঘটককে কল করে। ঘটক কল রিসিভ করলে একটু কুশল বিনিময় করার পরই মূল বিষয়ে আসে। রবি বলে, আগের মেয়েটাই তার পছন্দ।

ঘটক বলে, আগেরটা ছাড়ুন, এটা কি আপনার পছন্দ হয়েছে?

'এটা হবে না, আগেরটাই পছন্দ'

'কিন্তু... '

'কী, কিন্তু কেন.... '

'আগের টা একটু সমস্যা আছে'

'এত আমতা-আমতা করছেন কেন, কী হয়েছে খুলে বলুন'

'আসলে ওরা চাইছে না।'

'সমস্যা কী'

'মেয়ের বাবা ফোন করেছিল, মেয়ে এবং বাড়ির অন্যরা নাকি বলেছে ছেলে তাদের পছন্দ না'

'ও, তাহলে পরে কথা হবে' বলে বর ফোন রেখে দেয়।

উত্তরণ

আল আমিন

'শান্তি খুব অমূল্য জিনিস। সে কি আর এমনি এমনি লাভ করা যায়। গোটা জগতের মানুষ এটাই খুঁজে ফেরে। কিন্তু কখনো তা পাই কি? আসলে উপলব্ধিতেই আসে না কী ভাবে তা লাভ করা যায়। ভাবে অর্থেই তা সম্ভব, তাই অর্থের পেছনে ছুটে মরে মানুষ। আরো কত কী যে করে মানুষ তার কি ঠিক আছে! এই যে তুমি তোমার ছেলের জন্য, তার ভবিষ্যতের জন্য এত চিন্তিত। এভাবে কি হয়? কখনো কি এভাবে হয়?'

আবিরের সব কথা শুনতে ভালো লাগে, কিন্তু ছেলের প্রসঙ্গ এলেই মেঘনা কেমন হয়ে যায়। সে বলে— তাই বলে ছেলেকে ভালো স্কুলে ভর্তি করবে না?

আবির মৃদু হাসে। মেঘনা সেটা লক্ষ্য করে অভিমানের সুরে বলে, 'তোমার সঙ্গে কথা বলায় বৃথা। চাকরি করো তুমি, টাকা ইনকাম করো তুমি, সব ডিসিশন তো তুমিই নেবে। আমার কথার কি কোনো মূল্য আছে?'

মেঘনা ছেলের দিকে পাশ ফিরে শোয়। গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন সাত বছরের আকাশের মাথায় কপালে হাত বোলাতে থাকে। আবির এক রকম জোর করে মেঘনাকে নিজের দিকে ফেরায়, বলে তুমি এমন করছো কেন? আকাশ তো আমারও ছেলে নাকি! তার ভালো মন্দের কথা তো আমাকেও ভাবতে হয়। ও শিশু, ওর উপরে কেন বোঝা চাপাতে চাইছো। তুমি শিক্ষিত, আমি শিক্ষিত, অসুবিধা কোথায়! দুজনে মিলেই তো ছেলের দেখভাল করতে পারি, নাকি?

কয়েক দিন মেঘনা আর ছেলের ব্যাপারে কিছুই বলেনি আবিরকে। একদিন সন্ধ্যার দিকে অফিস থেকে আবির ফিরলে মেঘনা হাস্যোজ্জ্বল মুখ নিয়ে আবিরকে বলে, জানো, কাল দিদি আসছে।

'কোন দিদি'

'আরে তোমার দিদি, সাথে জামাই বাবু ও তার ছেলে।'

'ও, মৃন্ময়ী?'

'হ্যাঁ, কাল তো তোমার অফিস ছুটি। সকাল সকাল কেজি খানেক মটন নিয়ে আসবে।

'না, কাল অফিস ছুটি নেই, তবে আমি মটন নিয়ে এসেই বের হবো। একটু জল দাও, খুব জল তেষ্টা পেয়েছে।'

মেঘনা জল নিয়ে এলে আবির জল খেয়ে সোফায় মাথা এলিয়ে দিয়ে চোখ বোজে। টি টেবিলে গ্লাসটা রেখে পাশেই বসে মেঘনা। আবিরের হাতটা নিজের হাতের মধ্যে নিলে আবির চোখ খোলে। মেঘনার দিকে তাকিয়ে সে বুঝতে পারে মেঘনা কিছু একটা বলতে চাইছে। সে জানতে চাই মেঘনা কিছু বলবে কিনা।

মেঘনা একটু সাহস পায়, বলে আকাশকে এবার উর্জিতের স্কুলে ভর্তি করে দাও।

আবির সোজা হয়ে বসে, আবার শুরু করলে, একই জিনিস রোজ রোজ কেন বোঝাতে হয় তোমাকে!

আবিরের কথার মধ্যে কেমন একটা রুক্ষতার ভাব লক্ষ্য করে মেঘনা। কিন্তু এমন একটা সুযোগ যখন পাচ্ছে তখন ছেলেটাকে এমন নামি ভালো স্কুলে ভর্তি না করালে হয়। 'সুযোগ কি আর বারবার আসে' একথা ভেবেই মেঘনা আবার বলে, দিদি বলছিল, ওই স্কুলে তাদের পরিচিত একজন আছে, তাকে বললে নামমাত্র ডোনেশনেই ভর্তি নিয়ে নেবে।

এবার আবির গর্জন করে ওঠে— যাও এখান থেকে।

বিয়ের পর এই প্রথম এত রূঢ় ভাবে আবির মেঘনাকে কথা বললো। কোনো অবস্থাতেই কখনো মেঘনাকে সে আঘাত করেনি। সে মনে করতো তাদের মধ্যে প্রেম মাধুর্যতা থাকলে পৃথিবীর কোনো কষ্টই কষ্ট মনে হবে না। আর সে কথা মেঘনাকেও বলেছে অনেকবার। সেই আবিরের এহেন রুপ দেখে মেঘনা একেবারে স্থবির হয়ে যায়। বিছানাতেও চুপ করে পড়ে থাকে মেঘনা। ছেলেকে আজ মাঝখানে রেখে মেঘনা উল্টো দিকে মুখ করে শুয়েছে।

আবির বুঝতে পেরেছে ব্যাপারটা বেশিই হয়ে গেছে। মেঘনাকে কয়েকবার ডেকে যখন কোনো উত্তর পায় নি তখন সন্ধ্যার ব্যবহারের জন্য সাফাই দিতে শুরু করে। বলে, অফিসে একটা প্রবলেম হয়েছে, সে কারণেই মেজাজটা বিগড়ে ছিল তাই... আর কি... এই মেঘনা শুনছো?

আবির ঘুমন্ত ছেলের ওপর দিয়ে মেঘনার বাহুর উপর আলতোভাবে চাপ দেয়। মেঘনা হাতটা ছাড়িয়ে নিয়ে আর একটু দূরে সরে যায়। একটা পাশবালিশ পাশেই ছিল সেটা টেনে নেয় বুকের কাছে। আবির বুঝতে পারে না কী করবে। 'সরি' বলে ছেলেকে বুকের কাছে টেনে নেয় আবির।

পরের দিন সকাল সকাল মটন নিয়ে আসে আবির। তাকে আজ তাড়াতাড়ি অফিস যেতে হবে। খুব বিরক্তি আসছে আবিরের। ভেবেছিল মহালয়ার দিন পরিবার নিয়ে ঘুরতে যাবে সেটা আর হয়ে উঠলো না। তার উপর বৌ সেই যে কথা বলা বন্ধ করেছে তো করেছে। সব কিছুই করছে কিন্তু নীরবে। এ অবস্থায় তার অফিস যেতে ভালো লাগছে না। কিন্তু কোনো কিছু করার নেই, এটার দৌলতেই তার সংসার চলে।

আবির অফিস থেকে ফিরে দেখে সবাই ডাইনিং-এ বসে আছে। চায়ের আসর বসেছে তখন। সোফার এক পাশে জামাই বাবু আর অন্য পাশে দিদি মৃন্ময়ী, তাদের মাঝ খানে নাদুস নুদুস চেহারার ভাগনে উর্জিত আপেল খাচ্ছে। মৃন্ময়ী একটু তফাতে আর একটা সোফায় বসে টিভি দেখছে। অন্যান্য দিন মৃন্ময়ীই কপাট খুলে দেয়, আজ আকাশ খুলে দিল। দরজার পাশেই আকাশ 'বাবা' বলে জড়িয়ে ধরে আবিরকে, বলে, পিসি বলছে আমাকে নিয়ে চলে যাবে, আর তোমাদের সঙ্গে আমি নাকি থাকতে পাবো না, আমি যাবো না বাবা, ও বাবা... আমি যাবো না।

হালকা মুচকি হেসে ছেলেকে কোলে তুলে নিয়ে আবির বলে 'আচ্ছা'।

মৃন্ময়ী হেসে বলে 'যতই বায়না করো যেতে তোমায় হবেই' তারপর আবিরকে বলে 'যা ফ্রেশ হয়ে আয়, তারপর একসঙ্গে আড্ডা মারা যাবে'

জামাই বাবু বলে, তারপর শালা বাবু সব ভালো তো!

আবির মাথা নেড়ে হাসিমুখে ভালো থাকার কথা জানিয়ে একবার মেঘনার দিকে লক্ষ্য করে। দেখে এসবের প্রতি তার কোনো দৃষ্টি নেই। সে যেন তার আবির্ভাবের কোনো টেরই পাইনি। এক মনে সোফায় বসে চা খেতে খেতে টিভি দেখে চলেছে মেঘনা।

ফ্রেশ হয়ে আসার পরও দেখে সে ভাবেই নিশ্চুপ মেঘনা। সোফায় বসতে বসতে আবির গলাটা একটু ঝেড়ে নিয়ে বলে, চা পাওয়া যাবে?

মেঘনা উদাসিন থাকলেও কথাটা তার কানে যায়। হাতের কাপটা রেখে উঠে কিচেনে যায়। মেঘনা কিচেন থেকে ফেরার আগে দিদির চাকরি ও জামাই বাবুর অফিস সম্পর্কে, তাদের সম্পর্কে এলোমেলো কথা হতে থাকে। মেঘনা চা নিয়ে আসে এবং কোনো কথা না বলে আবিরকে দিয়ে আবার আগের মতো সোফায় বসে টিভির দিকে মন দেয়। আবির চায়ে চুমুক দিয়ে বলে, আমি একটা ডিসিশান নিয়েছি দিদি।

'কি ডিসিশান' দিদি ও জামাই বাবু জানতে চায়।

'আমার এক বন্ধু একটা স্কুলের হেড মাস্টার। তার স্কুলে বায়োলজির টিচার দরকার। কিন্তু স্কুল সার্ভিস পরীক্ষা দীর্ঘ দিন বন্ধ থাকায় ওরা স্কুলে টিচার পাচ্ছে না। এ পরিস্থিতিতে ওরা কন্ট্রাক্টচুয়াল টিচার নিতে চাইছে। ও বলছিল মেঘনার কথা।'

'আমি যাবো না'– মেঘনা টিভির দিকে তাকিয়েই বলে ওঠে।

মৃন্ময়ী বলে, 'মেঘনা তুমি না কোরো না, আবির তুই ফাইনাল করে দে।'

জামাই বাবু বলে, এত দিনে শালা বাবুর একটু শুভ বুদ্ধি হয়েছে, দুজনে ইনকাম করবে দেখবে শ্রী বৃদ্ধি তরতর করে হচ্ছে।

'দিদি আকাশটা থাক, ওকে আমি বাইরে দিতে পারবো না।' আবিরের চোখ ছল ছল করে ওঠে।

'এই তো বোকার মতো কথা হয়ে গেলো, ছেলের ভবিষ্যতের কথা তুই ভাববি না! তাছাড়া মেঘনাকে স্কুলে পাঠাবি ছেলেকে দেখবেটা কে!' বিস্ময় মিশ্রিত প্রশ্ন ছুড়ে দেয় মৃন্ময়ী।

'আমি দেখবো'

আবিরের কথায় জামাই বাবু হো হো করে হেসে ওঠে। মেঘনা এতক্ষণে ঘুরে বসে, বিস্ময়ের দৃষ্টিতে আবিরের দিকে তাকায়। মৃন্ময়ীও অবাক হয়, বলে— আর তোর অফিস!

'আমি অফিস ছেড়ে দেবো, বেসরকারী চাকরিতে প্রচুর চাপ, ভাবছি টিউশন পড়াবো।'

'বলছিস কী!' মৃন্ময়ী যেনো চমকে ওঠে।

'পাগলামি ছাড়ো শালা বাবু, যাও একটু রেস্ট করো।' বিজ্ঞের মত বলে জামাই বাবু।

সপ্তমীর রাতে পুজো দেখে আসার পর সকলকে খাওয়ানোর পর সবে শুয়েছে মেঘনা, হঠাৎ বিকট আওয়াজে উঠে বসে মেঘনা। সে বুঝতে পারে আওয়াজটা পাশের ঘর থেকে দিদি জামাই বাবুর ঝগড়ার আওয়াজ। আসলে কয়েক দিন থেকেই ছোটো খাটো ব্যাপারে তাদের ঝগড়া হচ্ছে সেটা মেঘনা লক্ষ্য করেছে। আজকে বাড়াবাড়িটা চরমে পৌঁছেছে।

মেঘনা কী করবে বুঝতে পারছে না। একবার ভাবে আবির কে ডাকবে কিনা। কিন্তু কী করে ডাকবে! গত চার পাঁচ দিনে একটা কথাও সে আবির কে বলেনি। যেদিন আবির তার স্কুলে পড়ানোর ব্যবস্থার কথা ও তার নিজের চাকরি ছাড়ার কথা বলে ছিল সেদিন মেঘনার প্রচুর কৌতুহল হওয়া সত্ত্বেও কোনো কিছু জিজ্ঞেস করবে না বলেই ঠিক করে। আসলে আবিরকে সে কষ্ট দিতে চেয়েছিল। তাকে অপমান করার শোধ সে এভাবেই নেবে বলে ভেবেছে।

একবার আবিরের দিকে হাত বাড়িয়েও সম্বরণ করে নেয়। ঘরের মধ্যে পায়চারি করতে থাকে আর ভাবতে থাকে, এরা করছে কি! এতো অর্থ, এতো আতিশয্য! এদের তো কোনো অভাব নেই। নাকি তাদের চেয়েও ওদের অভাব আরো বেশি?

মেঘনার আবিরের কথা মনে হয়। আবির বলে, অর্থ কি ভালোবাসার বিকল্প হতে পারে? অর্থ কি শান্তির বিকল্প হতে পারে?

মেঘনা কতক্ষণ এভাবে পায়চারি করলো জানে না। এক ঘন্টার কম নয়। একটা সময় যখন তীব্রতা কিছুটা কমলো সে সকালে তাড়াতাড়ি উঠতে হবে ভেবে শুয়ে পড়লো।

মৃন্ময়ী ও তার বর ছেলেকে নিয়ে পুজোটা কাটিয়ে তবে যাবে ভেবেছিল, কিন্তু দিন তিনেক পর অর্থাৎ অষ্টমীর দিন সকাল বেলাতেই তারা চলে যাবার জন্যে প্রস্তুত। আবির তাদের থেকে যাবার জন্যে পিড়াপিড়ি করে। মেঘনা মনে মনে ভাবে 'চলে গেলেই বাঁচি', কিন্তু মুখে বলে, ও দিদি থেকে যাও না, পুজোর ক'দিন আনন্দ করবো।

কিন্তু তারা থাকলো না। মেঘনা একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে যেন সমস্ত অশান্তি দূর হয়ে মনের মধ্যে একটা গভীর প্রশান্তি জেগে উঠলো। আবির মেঘনার মধ্যে একটা পরিবর্তন লক্ষ্য করলো, মেঘনার চলার মাঝে কাজের মাঝে কোথা থেকে যেন এক ছন্দ এসে উপস্থিত। মাঝে মাঝে মেঘনা গুনগুন করে রবীন্দ্রসংগীত গাইছে আর আপন মনে কাজ করে চলেছে।

বিকেলে ঘুরতে বেরিয়ে গোটা কতক ঠাকুর দেখে আর কিছু খাওয়া দাওয়া করে আবির কে শুনিয়ে ছেলেকে বলে, আজ আর দেরি করা যাবে না, বাড়ি চলো।

ছেলে আরো ঘুরতে চায়, কিন্তু মেঘনার বাড়ির প্রতি টান, 'বাবু আজ বাড়ি ফিরে চলো কাল আমরা অনেক ঘুরবো।

ছেলের কাছে প্রমিস করার পর তবে বাড়ি ফিরতে পারে। আজ বাড়ি গিয়েই আকাশকে খাইয়ে দেয়। আবির প্রতিদিনই রাতে ছাদে গিয়ে কিছুক্ষণ বসে, আজও যায়। ছেলে ঘুমালে মেঘনাও যায় প্রতিদিন, গিয়ে আবিরের সঙ্গে গল্প করে, যেটা এই ক'দিন হয় নি।

আবির উঠে নিচে যাচ্ছে এমন সময় দেখে মেঘনা উপরে আসছে। মেঘনার মুখে চাঁদের আলো পড়ছে আর তাতে তাকে অপরূপ লাগছে। আবির আবার নিজের চেয়ারটাতে বসে চাঁদের দিকে চায়। মেঘনা ধীরে ধীরে পাশের চেয়ারটিতে বসে আবিরের দিকে তাকিয়ে থাকে।

কিছুক্ষণ এইভাবে থাকার পর মেঘনা চাঁদের দিকে চেয়ে বলে, 'আমি যদি চাঁদ হতাম। কিন্তু কী আর করা যায়, দুর্ভাগ্য।'

আবির চকিতে মুখ ফিরিয়ে নিচের আলো আঁধারে আবিষ্ট গাছপালার দিকে দৃষ্টি দেয়। মেঘনা আবার

টিপুনি দেয়, ' মানুষের আঁধার কী করে যে ভালো লাগে বুঝি না।'

এবার আবির কোন রকম রেসপন্স করে না। মেঘনা আবিরের দিকে একটু চেপে বসে। তার পর আবিরের বাহুতে নিজের মাথাটা দিয়ে বলে, 'আমার কিন্তু আকাশ ভালো লাগে।'

আবির আর স্থির থাকতে পারে না, বলে, কোন আকাশ!

'আমার আকাশ' মেঘনার গলাটা একটু ভেজা ভেজা মনে হয় আবিরের।

ক্ষণিকের নিস্তব্ধতার পর আবার বলে, উর্জিত সুস্থ নয়, সে খেলাধুলা করে না, সে আকাশের সঙ্গেও মিশতে পারে না।

কয়েক মুহূর্ত থেমে আবার বলে, দিদি চাকরি করে, জামাই বাবু চাকরি করে, দুজনেই অর্থের পেছনে ছুটে মরে, একে অপরকে কেউ ভালোবাসে না। ছেলের দায়িত্ব ভাড়াটের হাতে...

'থাক ওদের কথা' মেঘনাকে থামিয়ে দেয় আবির।

এস আমাদের কথা বলি।

স্যাটায়ার

ঝোলাগুড় ও কানামাছি আখ্যান

অনীক

ঝোলা গুড়ে কানামাছি পড়িয়াছে। যত ডানা ঝাঁপটাইতেছে ততই ডুবিয়া যাইতেছে ! রাজ্য হইতে দেশ কেবলই হাহুতাশ– ডুবন্ত কানামাছির আর্তনাদ তাহা হাসি না কি কান্নার বোঝায় ভার

একটু ঝোলা গুড়ের স্বাদ পাইতে কানামাছিদিগের দেশ জুড়িয়া লম্ফ ঝম্ফ চলিতেছে। উহাদের প্রভুগণ কানা মাছির সংখ্যা বাড়ানোর সংক্রমণ ছড়াইতেছে। রাজ্য হইতে রাজ্যান্তরে ভাগাড় খুলিতেছে।

ঝোলা গুড়ে ল্যাপটাইয়া গলা অব্দি ডুবিয়া কানামছি পরম সন্তোষ লাভ করিতেছে। দৃষ্টি ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইতেছে। কৃমিকীট ইতর বিশেষ উহাদিগকে দেখিয়া বমন করিতেছে।

তথাপি উহাদের ভ্রুক্ষেপ নাই। মস্তিস্ক বন্ধক রাখিয়া হৃদয় খোয়াইয়া কেবল দেহ ধারণ করিয়া থাকিলে আফিমের আসক্তি ষোলো আনা টিকিয়া থাকে। অচেতন কানমাছিগণ তাই চিরঘুমন্ত। NRC হোউক অথবা কেয়ামত, উহারা নিশ্চল।

কানামছিগণ কী প্রকার নিশ্চল উহা লইয়া তর্ক চলিতে পারে। তবে উহাদের ঘুম কুম্ভকর্ণের ঘুমকে হারাইয়া ছাড়িবে ইহা সকলেই এক বাক্যে মানিয়াছে।

এক তার্কিক কহিল এই কানামছিগণ কী প্রকারের মনুষ্য হইবে? উহাদের হস্ত পদ একটি মাথা সবই রহিবে। মানুষের মতই দেখিতে হইবে। কিন্তু মনুষ্য কি না ইহা লইয়া সন্দেহের যথেষ্ট অবকাশ রহিয়াছে।

আর এক তার্কিক কহিল আচ্ছা উহারা গ্যাসের দাম বাড়িয়া যাইলে অথবা GST বাড়াইলে, ডিমানিটাইজেশনে অর্ধমৃত হইয়া কেমন করিয়া বাঁচিয়া রহে।

ঐ যে ইতিপূর্বে কহিয়াছি বন্ধু গণ, –আফিমের নেশা..। ইহা যে কী নেশা না খাইলে কি করিয়া বুঝাইবো?
আবার খাইলে ঝোলা গুড়ের দিকে এমনই ঝুঁকিয়া থাকিবে যে তুরিয়ো ভাব আসিয়া সমস্ত চেতনা আচ্ছন্ন করিয়া রাখিবে। তখন মরিলেই কী? আর না মারিলেই কী?

'কানামছি
নাচি নাচি
দাঁড়ায়বার সময় তো নাই..'

তাই তো নাম কানামছি।

তার্কিক কহিল– 'নোটবন্দির সময় এক কানামাছি এটিএম এ টাকা তোলার লাইনে মরিয়াছিল'।

কানামাছির সর্দারদের পিতামহ মুখ খুলিয়া কহিল, মরিয়াছে–

বেশ হইয়াছে
মহৎ কাজে শহীদ হইয়াছে।

হঠাৎ কোথা হইতে ছুটিতে ছুটিতে ঘাড় বাঁকা করিয়া এক কানামাছি আসিয়া তর্ক জড়িয়া দিলে, – বলিল, মহাশয় অন্তরে ভাবিয়া আমাদের কষ্ট বুঝিতে পারিবেন না। আপনি কাহারে শহীদ কহিতেছেন? আমার বাবা তো হাসপাতালেই মরিল বিনা চিকিৎসায়। ভাই চাকরি না পাইয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। বোনটা ঝোলাগুড়ের সদস্য হইয়াছিল। সে অনেককাল নিখোঁজ হইয়াছে। শুনিয়াছি দিল্লির কোন সদর অফিসে কাজ দিয়াছিল। কিন্তু ঐ পর্যন্তই। আর ফেরে নাই। অফিসে সন্ধান লইলে বলিয়াছে, সে অনেক দিন হইলো বাড়ি ফিরিয়াছে। কিন্তু সে বাড়ি ফেরে নাই।

আর কত শহীদ লইবেন?
– বলিয়া কান্না জুড়িয়া দিলো।
ইনিয়ে বিনিয়ে সুর ধরিলো –

ছোট্ট কানামাছি রে
তুই কি বাঁচিয়া
আছিস রে?
কোথায় গেলি বাবা
কানামাছি রে??

হা ভগবান মোদের বাঁচাইবে কে রে?

– বলিয়া হাউ মাউ করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে অদৃশ্য হইলো।

অদূর হইতে ছুটিয়া আসিলো ছিঁচকে কানামাছি। লোকে উহাকে টিকটিকি কানামাছি বলিয়া বেশি চেনে। সেই চিৎকার জুড়িয়া দিলে –

' আমার প্রিয় কানামাছি গণ আমাদের অভ্যন্তরে কিছু দেশদ্রোহী প্রবেশ করিয়াছে। উহারা কানামাছি সাজিয়া কানামাছি সাম্রাজ্যের বদনাম করিতেছে। আপনারা এই সকল লোকের কথায় বিশ্বাস করিবেন না। মনে রাখিবেন আমাদের অতীত গরিমা, অতীত ঐতিহ্য ফিরিয়া আনিতে হইবে।
এই ফাঁকে কিছু কানামাছি আসিয়া জয়ধ্বনি দিতে শুরু করিল।

জয় কানামাছি সাম্রাজ্যের জয়
জয় কানামাছি কি...
জয় বলদ পটল কি...
জয় অমাপ্রসাদ কি...
জয় ইন্দু ইন্দি ইন্দুস্তান কি...

টিকটিকি আবার শুরু করিলো...
আমরা সংখ্যা গরিষ্ঠতা পাইয়াছি... আমাদের সনাতন দেশ সনাতন রহিবে – গর্বে বুক আটখানা হইয়া যাইতেছে।
সেই দিন আসিতেছে মাছি গণ –
যেই দিন এক দেশে
একই ভাষা হইবে –
একই দল হইবে –
একই ধর্ম হইবে –

প্রভু সম্প্রতি বলিয়াছে

'এক বোল হইবে' –
প্রিয় কানামাছি ভাবুন, কানামাছি সাম্রাজ্যে কেবল কানামাছি থাকিবে। অন্য কাহারো স্থান হইবে না।

কানামাছি গণ
জোরসে বলো –!
গরব্ সে বলো –!

হাম –?

কানামাছি হে!
কানামাছি কি...?
জয়...।

একে একে কানামাছিগণ প্রস্থান করিলো।

দূরে আঁধারের ঝোলা গুড় হইতে আর এক অর্ধমৃত কানামাছির আবির্ভাব হইলো। অরে, তরে তো আমি চিনি রে – তুই তো টিকটিকি কানামাছি...
তুই তো এখন কানামাছি চাকের প্রধান উপদেষ্টা।

আমার ফেক আই-ডির কোটা পূরণ হইলে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ আমারে সরাইয়া তরে বসাইছে। আমার এখন ইনকাম বন্ধ। ছোটখাটো চুরি কইরা বাঁইচা আছি।

তোরো একদিন এইদিন আসিবে? সেইদিন দেখবি লম্বা চওড়া ভাষণ কোথায় থাকে?

এক তার্কিক সব শুনিতেছিল – সে মুখ খুলিল, কহিলো বর্ষায় মাছি অনেক বাড়িয়া যায়। ইহা সত্য মনে রাখিতে হইবে।
দিন যত যাইতেছে, মাছি সাম্রাজ্যের মাছির সংখ্যা দ্বিগুণ-তিনগুণ বহুগুণ হইয়া যাইতেছে। সম্রাট নেতা-মন্ত্রীরা ইহা লইয়া আত্মসন্তোষ করিতেছে। কিন্তু মাছি সাম্রাজ্যের তথা ভাগাড়ের রাত্রিদিন এক হইয়া যাইতেছে। মন্ত্রী কহিয়াছে হয় ছোট জাতের মাছিদের আত্মহত্যা করিয়া মরিতে হইবে নয়তো উহাদের ক্রসফায়ার করিয়া মারিয়া ফেলা হইবে। কারণ হিসাবে উহারা ইহাই স্থির করিয়াছে যে কেবলমাত্র যে সংখ্যা উচ্চবর্ণীয় সনাতন শ্রীমান মাছিদের সেবার জন্য লাগিবে তাহারা কেবল বাঁচিবার যোগ্য। ইহা লইয়া মন্ত্রণালয়ে অনেক কথা হইয়াছে তাহাতে বিরোধীরা একমত হইতে পারে নাই।
এক মন্ত্রী বলিয়াছে পূর্বে তো উহাদের কানে সিসা গলাইয়া ঢালিয়া দেওয়া হইত এবং জিব কাটিয়া লওয়া হইত, যাহাতে উহারা শিখিতে পড়িতে না পারে। তাহা হইলে আমাদিগের সনাতন ধর্মও বজায় থাকা যায়। পুরাতন চাউল ভাতে সব সময় বর্ধিত হইয়া থাকে। ইহাই ফলো করা উচিত বলিয়া আমি মনে করি।
আপাতত এই সব বিল উচ্চকক্ষে আটকাইয়া গিয়াছে।
ঝোলাগুড় চাটিতে চাটিতে আর এক খোঁড়া কানামাছির উদয় হইল। সে বলিল –
ভাইসব আমরা খুব আনন্দে আছি নাকি কষ্টে?
মরিয়া গিয়াছি? নাকি বাঁচিয়া আছি?
উড়িবার পাখা হারাইয়াছি। চলিবার পদ হারাইয়াছি তো কী?
থাকিবার আবাস হারাইবার উপক্রম হইয়াছে তাহাতে কী?
দেখিবার দৃষ্টি হারাইয়াছি। বেশ করিয়াছি!
কানামাছি সাম্রাজ্যে আমাদের সব কাড়িয়া লইয়াছে, বেশ করিয়াছে?
তবুও আমরা সংখ্যায় বাড়িতেছি। কানামাছি সাম্রাজ্যের প্রভুর জয়-জয়কার করিতেছি। ইহাই আমাদিগের পরম সৌভাগ্য!
তাঁহার জয় হোক। জয়স্তু।

কবিতা

পরশ

মিনারুল হক

আমাকে আর কত অপমান, লাঞ্ছনা করবে!
তবুও আমি বার বার তোমার কাছে ফিরে আসি
মনে আছে যেদিন তুমি পেয়েছিলে আমার স্পর্শ,
দেখেছিলে আমার সৌন্দর্য, সেকথা কি ভুলতে পারো?

আজ যারা তোমাকে ঘিরে রয়েছে, তাদের থেকে তুমি
কি সেই অনাবিল আনন্দ, আর নির্মল হাসি পেয়েছো?
তবুও তুমি কেন, তাদের ছাড়তে পারো না?
কোন মোহের জালে আটকে থাকো?

তোমাকে আমার কাছে ফিরে আসতেই হবে
তাদের কী কুৎসিত রূপ, কী হিংস্রতা
তুমি জানো না?
সর্বদা তোমায় খোঁচাতে থাকে,
তারা তো তোমায় ভালোবাসে না,
সে সব তুমি মর্মে মর্মে পেয়েছো, আমিও জানি

তাই তাদের বাহিরের রঙচং, সং সাজের সাজনে
তারা কখনোই তোমায় আমার পরশ দিতে পারে,
পেরেছে?
তাদের জন্য তুমি আমার উপর কতনা রহস্যের
মায়াজাল বিছালে, তবুও আমি বার বার সেই জাল
ভেদ করেছি, কেন? তুমি তা জানতে চাও?
আমি তোমায় ভালোবাসি
তারা ভালবাসে না
ভালো বাসতে পারে না, জানে না
তাদের তো মন নেই

আমার মত রূপ নেই, অনুভূতি নেই
তারা মন ছুঁতে পারে না
আমার ছোঁয়ায় কেমন রঙিন হয়েছিলে
সে কথা ভুলতে পার?

ডাকিনী, মায়াবিনীরা ঘিরে রেখেছে
তারা কোন নর্দমা আর ভাগাড়ে নিয়ে যায়
তুমি দেখোনি?
আর আমি তোমায় কলকল নদির মনোরম পাড়ে
নিয়ে যাই নি, তোমার মনে নেই সেই জ্যোৎস্না-স্নিগ্ধ
অপরূপ রাতের কথা, মনে নেই সেই কোকিলের মিষ্টি
সুরের ছন্দ?
এখনো সময় আছে, তুমি ফিরে এসো আমার কাছে।

মাছরাঙা দিন

তুষার ভট্টাচার্য

ব্যর্থতা— আমি মহীনের টগবগে কালো ঘোড়ার পিঠে চেপে চলে যাবো
ভোর রোদ্দুরে জেগে ওঠা নদির আয়নার দিকে;
নুন ঘাম জলে ভেজা দুহাতের মুঠোয় তুলে নিয়ে আসবো—
নালিম মাছরাঙা রঙের দিন;
দেখি কে আমাকে নিরাশার লোহার শিকলে বেঁধে আটকে রাখে অন্ধকারে নির্জন খাদের কিনারে?
ব্যর্থতার অতীত ছাইপাশ, খড়কুটো আমি পিছনে ফেলে রেখে এসে
পায়ে পায়ে একদিন চলে যাবো স্বপ্নীল ওই রূপোলি পাহাড় চূড়োয়!

একা

তমাল মুখোপাধ্যায়

একা বাচাঁ সম্ভব নয়।
একা-একা মরাও কঠিন।

কিছু লোক একা হতে পারে –
একা লাগা সব্বার সয় না....

আমিও বিগত হবো –
শেষকালে রেখে যাবো
মহান-স্বদেশ
থেকে যাবে জায়া-কন্যারা
পাঁচ-সাত মিনিটের কান্না

যতক্ষণ নিরালম্ব থাকা
চেষ্টা তো থাকতেই পারে
কয়েকটা মুখ মনে রাখা।

আমি বেঁচে আছি তাই –
বিধাতাও দীর্ঘায়ু হলো....

রথের রশি

ফিরোজ

তুমি কেবল চেয়ে থাকো
দেখো আরো দেখো
শুধু ভালোবেসো না
সব পুড়ে
ছারখার হয়ে যাক

মিশে যাক মাটিতে
আকাশ থেকে আগুন ঝরুক
কেবল নির্লিপ্তভাবে
তুমি চেয়েই থাকো

পুড়ে ছারখার হয়ে যাক বৃষ্টি অরণ্য
নাড়ী ছেড়া তীব্র আকুতিতে জন্ম
নেওয়া সুন্দরতম অপুষ্ট শিশুটিকে
খুবলে খাক কাক শকুনে

তুমি কেবল চেয়ে থাকো
ফোরাত মিসিসিপি নীলনদ
গঙ্গা-পদ্মা-যমুনার তীর ছুঁয়ে
লাশ-গোনো

পশুর লাশও মানবাধিকারের (!)
হাটে বিকোয়

মানুষের লাশ তো!
সে তো
দারিদ্র্য-বিষয়ক সেমিনার আর
গবেষণার (!) বিষয়
অমূল্য নথি সাজানো টেবিলের
চিকন রিপোর্টেই নোবেল জুটে যায়
কর্পোরেট লালিত্যে

তবু তুমি দেখো না একবার
ইতিহাসের পাতা উল্টিয়ে !

শুধু তুমি আবর্তিত স্রোতের ঢেউ
গুনে গুনে ঝড়ের রাতেও চেয়ে থাকো
অপলক

কত অমানিশা পার হয়
নিনির্মেষ তারা গোনা রাত তবু
ভোর হয় না

মেক্সিকো নদীর কিনারায় ভেসে ওঠে
রক্তাক্ত মৃত শিশুর লাশ
বর্বর তো বন্ধ চোখে প্রাচীর তুলতে
চাই
কিছুই দেখে না
অন্ধ-ধৃতরাষ্ট-ময় পৃথিবীর আকাশে
কেবল চিল আর শকুন ওড়ে
অভিশপ্ত জননী গান্ধারীর গোংরানো
আর্তনাদ শুনতে পাই

তুমি নীরব—
আর একটা কুরুক্ষেত্র তবুও সুদূর!

হায় ! ফ্যারাও রাজের জীবন্ত মমি
দেশ-বিশ্ব খুঁড়ে অনায়াসেই মাথা পিছু
ভোট কিনে নেয়
সহস্র-কোটি পান্ডুরতার জারণেও
পান্ডুলিপি কথা কয় না
তুমি তো ইতিহাস দেখেছো ভল্গার
তীরে
হাজার বছরের দাসত্বের বন্ধন মুক্তি
সোনালী-উষার ভোরে মরু কাঁপানো
শহরে জমজম কূপও দেখেছো

তবুও তুমি আজ নীরব—

রথের রশি যে কে সেই পড়ে রয়
টান পড়ে না একটুও
তোমার অস্তিত্ব কতকাল প্রহর গুণবে?

পুনঃস্মরণিকা

হিন্দুমুসলমান

শ্রীযুক্ত কালিদাস নাগকে লিখিত (শান্তিনিকেতন)

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

কল্যাণীয়েষু

...

ঠিক যখন আমার জানলার ধারে বসে গুঞ্জনধ্বনিতে গান ধরেছি-

আজ নবীন মঘের সুর লেগেছে
আমার মনে,
আমার ভাবনা যত উতল হল
অকারণে-

ঠিক এমন সময় সমুদ্রপার হতে তোমার প্রশ্ন এল, ভারতবর্ষে হিন্দু-মুসলমান-সমস্যার সমাধান কী। হঠাৎ মনে পড়ে গেল, মানবসংসারে আমার কাজ আছে- শুধু মেঘমল্লারে মেঘের ডাকের জবাব দিয়ে চলবে না, মানব-ইতিহাসের যে-সমস্ত মেঘমন্দ্র প্রশ্নাবলী আছে তারও উত্তর ভাবতে হবে। তাই অম্বুবাচীয় আসর পরিত্যাগ করে বেরিয়ে আস্তে হল।

পৃথিবীতে দুটি ধর্মসম্প্রদায় আছে অন্য সমস্ত ধর্মমতের সঙ্গে যাদের বিরুদ্ধতা অত্যগ্র– সে হচ্ছে খৃস্টান আর মুসলমান ধর্ম। তারা নিজের ধর্মকে পালন করেই সন্তুষ্ট নয়, অন্য ধর্মকে সংহার করতে উদ্যত। এইজন্যে তাদের ধর্ম গ্রহণ করা ছাড়া তাদের সঙ্গে মেলবার অন্য কোন উপায় নেই। খৃস্টান্ধর্মাবলম্বীদের সম্বন্ধে একটি সুবিধার কথা এই যে, তারা আধুনিক যুগের বাহন; তাদের মন মধ্যযুগের গন্ডির মধ্যে আবদ্ধ নয়। ধর্মমত একান্তভাবে তাদের সমস্ত জীবনকে পরিবেষ্টিত করে নেই। এইজন্যে অপর ধর্মাবলম্বীদেরকে তারা ধর্মের বেড়ার দ্বারা সম্পুর্ণ বাধা দেয় না। য়ুরোপীয় আর খৃস্টান এই দুটো শব্দ একার্থক নয়। 'য়ুরোপীয় বৌদ্ধ' বা য়ুরোপীয় মুসলমান'শব্দের মধ্যে স্বতোবিরুদ্ধতা নেই। কিন্তু ধর্মের নামে যে জাতির নামকরণ ধর্মমতেই তাদের মুখ্য পরিচয়। 'মুসলমান বৌদ্ধ' বা মুসলমান খৃস্টান' শব্দ স্বতঃই অসম্ভব। অপর পক্ষে হিন্দুজাতিও এক হিসাবে মুসলমানদেরই মতো। অর্থাৎ, তারা ধর্মের প্রাকারে সম্পুর্ণ পরিবেষ্টিত। বাহ্য প্রভেদটা হচ্ছে এই যে, অন্য ধর্মের বিরুদ্ধতা তাদের পক্ষে সকর্মক নয়– অহিন্দু সমস্ত ধর্মের সঙ্গে তাদের non-violent non-co-operatrion । হিন্দুর ধর্ম মুখ্যভাবে জন্মগত ও আচারমূলক হওয়াতে তার বেড়া আরো কঠিন। মুসলমানধর্ম স্বীকার করে মুসলমানের সঙ্গে সমানভাবে মেলা যায়, হিন্দুর সে পথও অতিশয় সংকীর্ণ। আহারে ব্যবহারে মুসলমান অপর সম্প্রদায়কে নিষেধের দ্বারা প্রত্যাখ্যান না, হিন্দু সেখানেও সতর্ক। তাই খিলাফত উপলক্ষে মুসলমান নিজের মসজিদে এবং অন্যত্র হিন্দুকে যত কাছে টেনেছে হিন্দু মুসলমানকে তত কাছে টানতে পারে নি। আচার হচ্ছে মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্বন্ধের সেতু, সেইখানেই পদে পদে হিন্দু নিজের বেড়া তুলে রেখেছে। আমি যখন প্রথম আমার জমিদারি-কাজে প্রবৃত্ত হয়েছিলুম তখন দেখেছিলুম, কাছারিতে মুসলমান প্রজাকে বসতে দিতে হলে জাজিমের এক প্রান্ত তুলে দিয়ে সেইখানে তাকে স্থান দেওয়া হত। অন্য-আচার-অবলম্বীদের অশুচি বলে গণ্য করার মতো মানুষের সঙ্গে মানুষের মিলনের এমন ভীষণ বাধা আর কিছু নেই। ভারতবর্ষের এমনি কপাল যে, এখানে হিন্দুমুসলমানের মতো দুই জাত একত্র হয়েছে– ধর্মমতে হিন্দুর বাধা প্রবল নয়, আচারে প্রবল, আচারে মুসলমানের বাধা প্রবল নয়, ধর্মমতে প্রবল। এক পক্ষের যে দিকে দ্বার খোলা, অন্য পক্ষের সে দিকে দ্বার রুদ্ধ। এরা কী করে মিলবে? এক সময়ে ভারতবর্ষে গ্রীক পারসিক শক নানা জাতির অবাধ সমাগম ও সম্মিলন ছিল। কিন্তু মনে রেখো, সে 'হিন্দু' যুগের পূর্ববর্তী কালে। হিন্দুযুগ হচ্ছে একটা

প্রতিক্রিয়ার যুগ— এই যুগে ব্রাহ্মণ্যধর্মকে সচেষ্টভাবে পাকা করে গাঁথা হয়েছিল। দুর্লঙ্ঘ্য আচারের প্রাকার তুলে এ'কে দুষ্প্রবেশ্য করে তোলা হয়েছিল। একটা কথা মনে ছিল না, কোনো প্রাণবান জিনিসকে একেবারে আটঘাট বন্ধ করে সামলাতে গেলে তাকে মেরে ফেলা হয়। যাই হোক, মোট কথা হচ্ছে বিশেষ এক সময়ে বৌদ্ধযুগের পরে রাজপুত প্রভৃতি বিদেশীয় জাতিকে দলে টেনে বিশেষ অধ্যবসায়ে নিজেদেরকে পরকীয় সংস্রব ও প্রভাব থেকে সম্পূর্ণ রক্ষা করবার জন্যেই আধুনিক হিন্দুধর্মকে ভারতবাসী প্রকান্ড একটা বেড়ার মতো করেই গড়ে তুলেছিল। এর প্রকৃতিই হচ্ছে নিষেধ এবং প্রত্যাখ্যান। সকল প্রকার মিলনের পক্ষে এমন সুনিপুণ কৌশলে রচিত বাধা জগতে আর কোথাও সৃষ্টি হয় নি। এই বাধা কেবল হিন্দু-মুসলমানে তা নয়। তোমার আমার মতো মানুষ যারা আচারে স্বাধীনতা রক্ষা করতে চাই, আমরাও পৃথক, বাধাগ্রস্ত। সমস্যা তো এই, কিন্তু সমাধান কোথায়? মনের পরিবর্তনে, যুগের পরিবর্তনে। য়ুরোপ সত্যসাধনা ও জ্ঞানের ব্যাপ্তির ভিতর দিয়ে যেমন করে মধ্যযুগের ভিতর দিয়ে আধুনিক যুগে এসে পৌচেছে, হিন্দুকে মুসলমানকেও তেমনি গন্ডির বাইরে যাত্রা করতে হবে। ধর্মকে কবরের মতো তৈরি করে তারই মধ্যে সমগ্র জাতিকে ভূতকালের মধ্যে সর্বতোভাবে নিহিত করে রাখলে উন্নতির পথে চলবার উপায় নেই, কারো সঙ্গে কারো মেলবার উপায় নেই। আমাদের মানসপ্রকৃতির মধ্যে যে অবরোধ রয়েছে তাকে ঘোচাতে না পারলে আমরা কোনোরকমের স্বাধীনতাই পাব না। শিক্ষার দ্বারা, সাধনার দ্বারা সেই মূলের পরিবর্তন ঘটাতে হবে— ডানার চেয়ে খাঁচা বড়ো এই সংস্কারটাকেই বদলে ফেলতে হবে— তার পরে আমাদের কল্যাণ হতে পারবে। হিন্দুমুসলমানের মিলন যুগপরিবর্তনের অপেক্ষায় আছে। কিন্তু এ কথা শুনে ভয় পাবার কারণ নেই— কারণ, অন্য দেশে মানুষ সাধনার দ্বারা যুগপরিবর্তন ঘটিয়েছে, গুটির যুগ থেকে ডানা মেলার যুগে বেরিয়ে এসেছে। আমরাও মানসিক অবরোধ কেটে বেরিয়ে আসব— যদি না আসি তবে, নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়। ইতি ৭ই আষাঢ় **১৩২৯**।

(কালান্তর প্রবন্ধ গ্রন্থ থেকে নেওয়া 'হিন্দুমুসলমান' প্রবন্ধের অংশ। বানান অপরিবর্তিত।)

‘অস্তিত্ব’ প্রকাশিত গ্রন্থাবলি

১। অস্তিত্বঃ প্রবেশিকা (২১টি প্রবন্ধ)	১৫০.০০
২। অস্তিত্ব △ মানুষঃ দেহপূর্ব, দেহান্তপূর্ব এবং ... বর্তন ক্রমঃ এক	২০০.০০
৩। অস্তিত্ব △ মানুষঃ দেহপূর্ব, দেহান্তপূর্ব এবং ... বর্তন ক্রমঃ দুই	২০০.০০
৪। দেহমনের নিয়ন্ত্রণ এবং...	১৩০.০০
৫। জীবন দিশারী ‘অস্তিত্ব’	৩০.০০
৬। মেধা প্রতিভা কি ভাগ্য (!) বাচক? কী তার লভ্য প্রযুক্তি?	১৫০.০০
৭। দাম্পত্য প্রযৌক্তিক পরিবার সমিতি	৩০.০০
৮। বস্তু প্রযুক্তি নির্মাণী ‘অস্তিত্ব’	২৫.০০
৯। সত্তার অর্গল ভাঙাটাই মনের দরজা খোলার রহস্য	৪০.০০
১০। শ্রমমূল্যের শান্তি রথ	১০০.০০

প্রকাশক: গাইডেন্স ফাউন্ডেশন
ফোন: ০৩৩-২২৮০-৬৭০৯/৫৫০৫
১৯৭ পার্কস্ট্রিট, কলকাতা-১৭, (পার্ক সার্কাস ময়দানের পাশে)
যোগাযোগ: ৯৮৩০০৬৯৫২৫
E-mail: emdadul197@gmail.com

Mob: 9046822217

BABUL CHANDRA DEY

(Government Contractor & Order Suppliers)

Prop:- BABUL CHANDRA DEY

VILL– BASANTAPUR ◆ P.O– AKSHAYNAGAR
P.S– KAKDWIP ◆ DIST– S. 24 PARGANAS
PIN-743347.

Issue date 5 November 2019.
Vol. 1, Issue 4 & 5 Voice mark

সাংস্কৃতিক বন্ধ্যাত্ব ও রাজনৈতিক দিশাহীনতায় আর্থসমাজ অস্থির। তার লক্ষ্য নির্ণয়ে ব্যর্থ। এই সংকটাপন্ন পটভূমিতে শান্তি লক্ষ্যে– ১। অস্তিত্ব: প্রবেশিকা (২১টি প্রবন্ধ) ১৫০. ২। মানুষ: দেহপূর্ব, দেহান্তপূর্ব এবং ... (বর্তন ক্রম: এক) ২০০. ৩। মানুষ: দেহপূর্ব, দেহান্তপূর্ব এবং ... (বর্তন ক্রম: দুই) ২০০. ৪। দেহমনের নিয়ন্ত্রণ এবং ... ১২০. ৫। শ্রমমূল্যের শান্তি রথ ১০০.

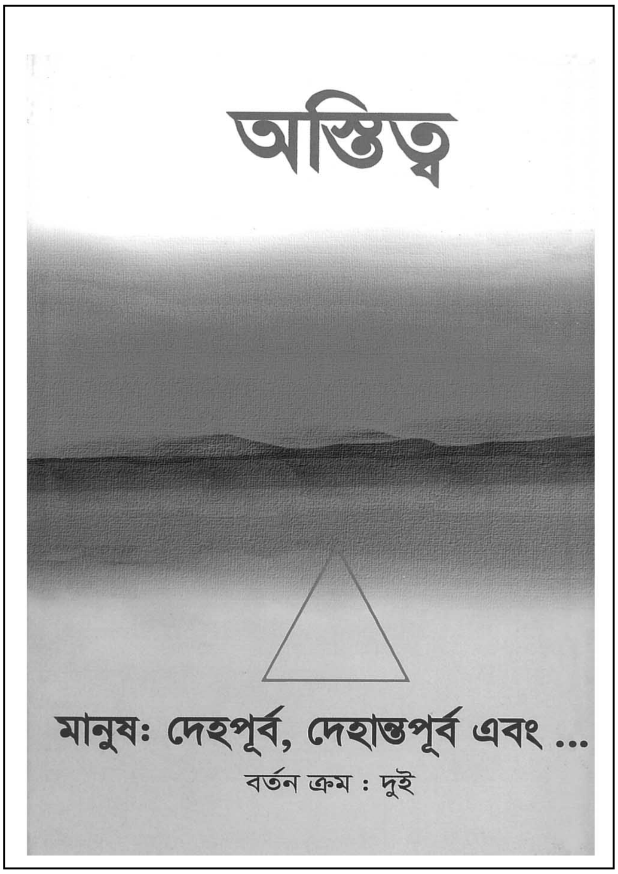

প্রকাশক: গাইডেন্স ফাউন্ডেশন
ফোন: ০৩৩-২২৮০-৬৭০৯/৫৫০৫
১৯৭ পার্কস্ট্রিট, কলকাতা-১৭, (পার্ক সার্কাস ময়দানের পাশে)

Published by Md. Firoz Hossain from Pirtala, Upar Fatepur, Lalgola, Murshidabad, Pin-742148 and printed by him at M/s. KIS Offset Press, Berhampore, Murshidabad, Pin-742101.